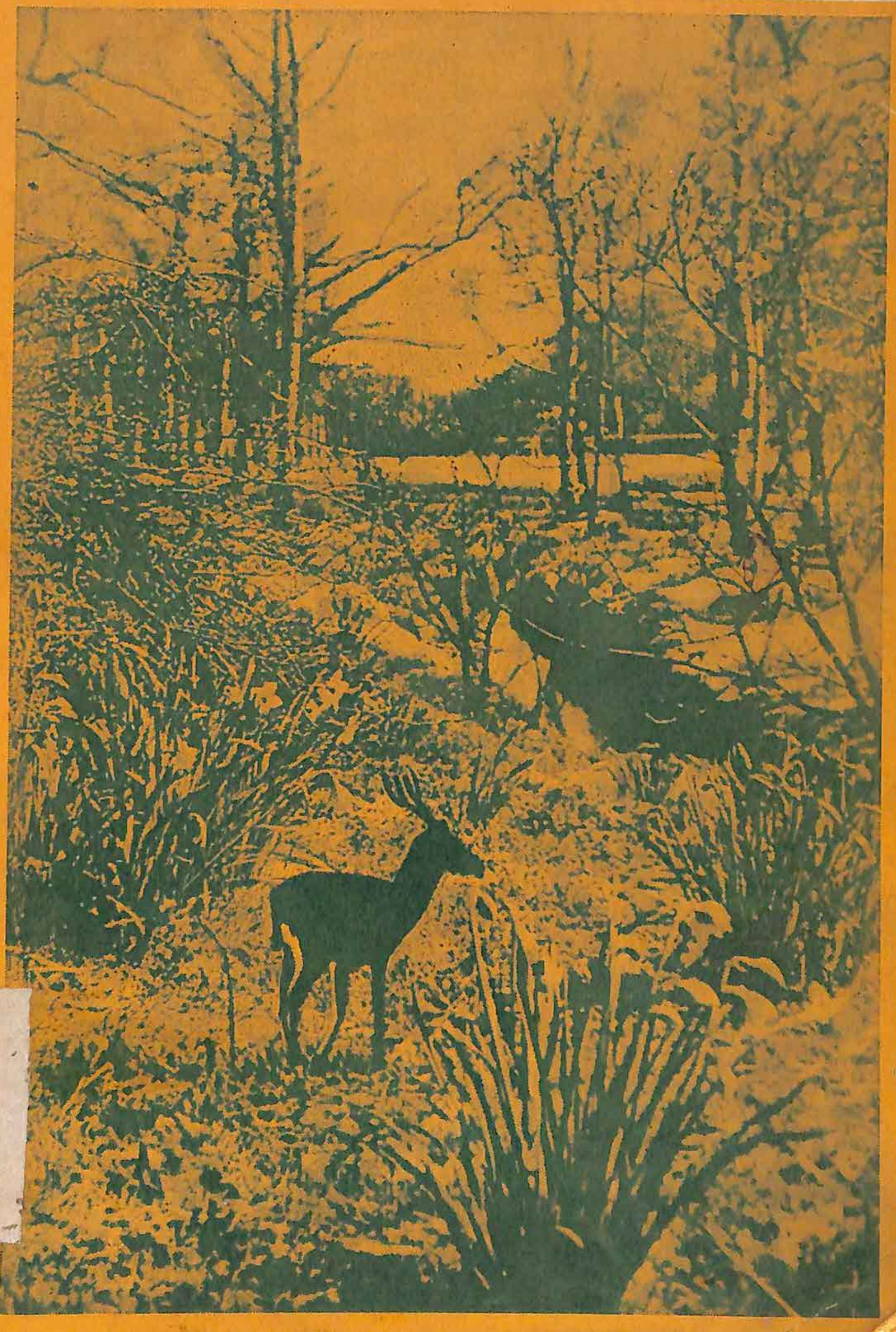
পরিবেশ চেতনা



সলিল
লাহিড়ী

পরিবেশ চেতনা

4·7

১০৯৫

সলিল লাহিড়ী

বি. এস-সি ; বি. ই ; এফ. আই. ই (ইণ্ডিয়া) এফ. আই. পি. এইচ. ই. (ইণ্ডিয়া), এম. আই. ষ্ট্রাক্ট. ই (ইণ্ডিয়া) ; এ. এম. এস. ই (লণ্ডন) প্রাক্তন ভিজিটিং প্রফেসর, আসাম ইনজিনিয়ারিং কলেজ ; সভাপতি, ইনজিনিয়ারিং শাখা, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (১৯৮৩) ; চেয়ারম্যান, এ্যানভায়রনমেণ্টল বিভাগ, ইনষ্টিটিউট অফ ইনজিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া) [প. বঙ্গ শাখা]

ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, ইনষ্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ্ ইনজিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া) ; চীফ ইনজিনিয়ার, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ওয়াটার এ্যাণ্ড সানিটেশন অথরিটি (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা)

পারমিতা পাবলিকেশন

৩ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
ডিসেম্বর, ১৯৮৩

প্রকাশক ঃ
রত্না ঘোষ
৩. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
ক লকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ
এম. এম. দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০, ডবলু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ছবি ঃ সলিল লাহিড়ী ও চারু খান

মূল্য ঃ পনের টাকা

PARIBESH CHETANA
in bengali
an introduction of pollution, its effect and control
—by Salil Lahiri

আজ যারা পরিবেশের শিকার হোতে চলেছে, তাদের সচেতন করার জন্য, ভবিষ্যতের সেই মানুষ, আজকের কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে—

পরিবেশ চেতনার কথা—

পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞান তার অগ্রগতি চালাচ্ছে। কলকারখানা, নগরবসতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। হয়ত মনে হচ্ছে তোমাদের—আমরা এগিয়ে চলেছি, আমাদের উন্নতি হচ্ছে। আসলে কিন্তু ভয়ংকর বিপদের দিকে এগিয়ে চলছি।

তোমরা যে মাটিতে বাস করছ, যে নদী-বাতাসকে উপভোগ করছ, যে শব্দ তরঙ্গ কানে আসছে, তাদের সমন্বয়ের মধ্যে আমরা বিপর্যয় এনে ফেলেছি। তাদের বিষিয়ে দিয়ে, মানুষ পশু-পাখী গাছপালা সবাইকে বিপদের দিকে নিয়ে চলেছি।

এই ভয়ংকর বিপদই হচ্ছে পরিবেশ-দূষণ। তাই পরিবেশ নিয়ে ভাবনা, তাকে নিয়ে চিন্তা, যদি ছোট বয়স থেকেই কর, তবে চারপাশের এই পরিবেশকে অনেকটা নির্মল—সুস্থ করে তুলতে পারবে তোমরাই। মনে রেখো, নির্মল সুস্থ পরিবেশ, সুস্থ জীবনের সূচনা করে।

পরিবেশ নিয়ে এই চেতনা তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে যাক, আর সেই চেতনায় পরিবেশ সংরক্ষিত হোক্, এই আশায় এই বই তোমাদেরই জন্য লেখা হোল।

সলিল লাহিড়ী

এই লেখকের বই ঃ

- সাগরপারের রূপকথা (২য় সংস্করণ) (সচিত্র)
- রূপকথার পারস্য (সচিত্র)
- গল্পের দেশ ইরাক (সচিত্র)
- জলতরঙ্গ (উপন্যাস)
- আন্নাসায়রের হাসিকান্না (উপন্যাস)
- কাশ্মীরের ঝঙ্কার (থ্রিলার)
- জগৎশেঠের রক্ত মোহর (থ্রিলার)
- বুন্দেলখণ্ডে হীরক জ্বলে (থ্রিলার)
- ছায়া-প্রতিচ্ছায়া (কবিতা)
- লাহিড়ী সিভিল ইনজিনিয়ারিং হ্যাণ্ড বুক (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। [৪ খণ্ডে সমাপ্য]
- পরিবেশ ভাবনা

ভূমিকা

West Bengal Secretariate Department

Of Environment, Writer's Building

পরিবেশকে নিয়ে সর্বস্তরেই সবিশেষ চিন্তা চলছে। দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা হচ্ছে, সরকারী ও বেসরকারী স্তরে।

কিন্তু আমার মতে, পরিবেশ দূষণ, সবচেয়ে বেশী করছেন মানুষরাই, মানুষদের সৃষ্ট সভ্যতাই।

এজন্যই পরিবেশ রক্ষার গোড়ার কাজ হচ্ছে—সচেতনতা। সেটা তখনই সম্ভব, যখন ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের দায়িত্ব যাদের হাতে সেসব আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা কিশোর-কিশোরীরা এমন কি সাধারণ মানুষরাও যদি জানে দূষণ কি, কেন হয়, প্রতিরোধের উপায় কি ?

আমার বিশ্বাস, অজ্ঞতাজনিত দূষণ কম হয় না, আর তা দূর করা সহজ ও ব্যয়সাধ্যও নয়। এজন্যই প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তর থেকে যদি পরিবেশকে নিয়ে ভাবনার চেতনা ছোটদের মনে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে পরিবেশ সংরক্ষণের এক বিরাট হাতিয়ার তৈরী হয়ে যাবে।

এই প্রচেষ্টায়, শ্রীসলিল লাহিড়ী পূর্বেই ব্রতী হয়ে 'পরিবেশ ভাবনা' নামের একটি বই লেখেন। জল-স্থল-বাতাস-শব্দ দূষণের কথা সামগ্রিকভাবে সেই বই-এ থাকলেও বিষয়বস্তুকে আরও সহজতর করে ছোটদের কাছে তুলে ধরবার জন্য এবার লিখেছেন, "পরিবেশ-চেতনা"।

অজস্র ছবি, সহজবোধ্য সরলভাবে লেখায় বইটি সত্যিই ছোটদের বই হয়ে উঠেছে। বাংলায় এই জাতীয় বই লিখে শ্রীলাহিড়ী সত্যিকার জনচেতনার কাজে এগিয়েছেন ও পরিবেশ দূষণরোধের সহজতম পন্থাকে তুলে ধরেছেন। বইটি প্রতিটি স্কুল ও লাইব্রেরীর পক্ষে অমূল্য সম্পদ হবে, এই আশা করি।

সবশেষে, পুস্তকটির জন্য শ্রীলাহিড়ীকে ধন্যবাদ জানাই।

ইতি

ভবানী মুখার্জি

পরিবেশ মন্ত্রী, পশ্চিম বঙ্গ সরকার

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩

কলিকাতা-৭০০০০১

মুখবন্ধ

West Bengal Secretariate Department
Of Health And Family Welfare
1, Kiron Sankar Roy Road
New Secretariate Building

গত কয়েক দশক ধরে পৃথিবীজুড়েই পরিবেশ ও পরিবেশরক্ষণ নিয়ে নানান স্তরে কর্মোদ্যম আরম্ভ হয়েছে।

মানুষ, প্রাণিজগৎ, প্রকৃতি সবার মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্যই পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা চলছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের পরিবেশ কলুষিত হয়ে বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছাবার আগেই যদি প্রতিরোধক ও প্রদূষণ নিবারণ ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেটাই হবে সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

কিন্তু এই প্রচেষ্টা তখনই সম্ভব হবে, সফল হবে, যখন জনগণের মধ্যে সচেতনতা আসবে। তাই এই নিয়ে আমাদের সবাইকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে হবে, এবং এজন্যই পরিবেশ দূষণের কারণগুলো সম্বন্ধে জনসাধারণের, কিশোর-কিশোরীদের কিছু জ্ঞান থাকা দরকার।

সুন্দর পরিবেশই সুস্বাস্থ্য আনে এবং ছোটদের মনের গঠন চরিত্র সব কিছুকেই সুন্দর—সুদৃঢ় করে। পরিবেশের সামগ্রিক সংরক্ষণ ও দূষণ প্রতিরোধ উদ্ভিদ, প্রাণী ও জড় জগতকেই যে শুধু ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায় তা নয়, বহু অজানিত বিপর্যয়ের হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করে। এজন্যই পরিবেশ সম্বন্ধে সামগ্রিক চেতনা আনা দরকার।

ছেলেমেয়েরা ছোট বয়স থেকেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেমন সচেতন হয়, পরিবেশ নিয়েও সেই সচেতনতা আনা দরকার। 'পরিবেশ-চেতনা' পুস্তকটি সেই দূরূহ কাজ সমাধা করবে এই আমার বিশ্বাস। এজন্যই এই বই-এর লেখক, আমার প্রিয় অনুজ, সি. এম ডব্লিউ. এস-এর মুখ্য বাস্তুকার, শ্রীসলিল লাহিড়ীকে ধন্যবাদ জানাই।

পরিবেশ, দূষণ এবং উদ্ভিদ-প্রাণিজগতে তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধক নিয়ে এই লেখকই বোধ হয় প্রথম বাংলায় বই লেখেন 'পরিবেশ-ভাবনা।' সেই পুস্তকের বিষয়বস্তু যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বমূলক ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তুকে সাধারণের ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আরও সহজতর করার তাগিদে লেখকের এই বই 'পরিবেশ চেতনা' যথার্থই ছাত্র-ছাত্রীদের বই হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি।

আবার বলি, বইটি সহজবোধ্য, মনোগ্রাহী ও সুখপাঠ্য হয়েছে। স্কুল ও লাইব্রেরীর জন্য বইটি মূল্যবান সংযোজন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

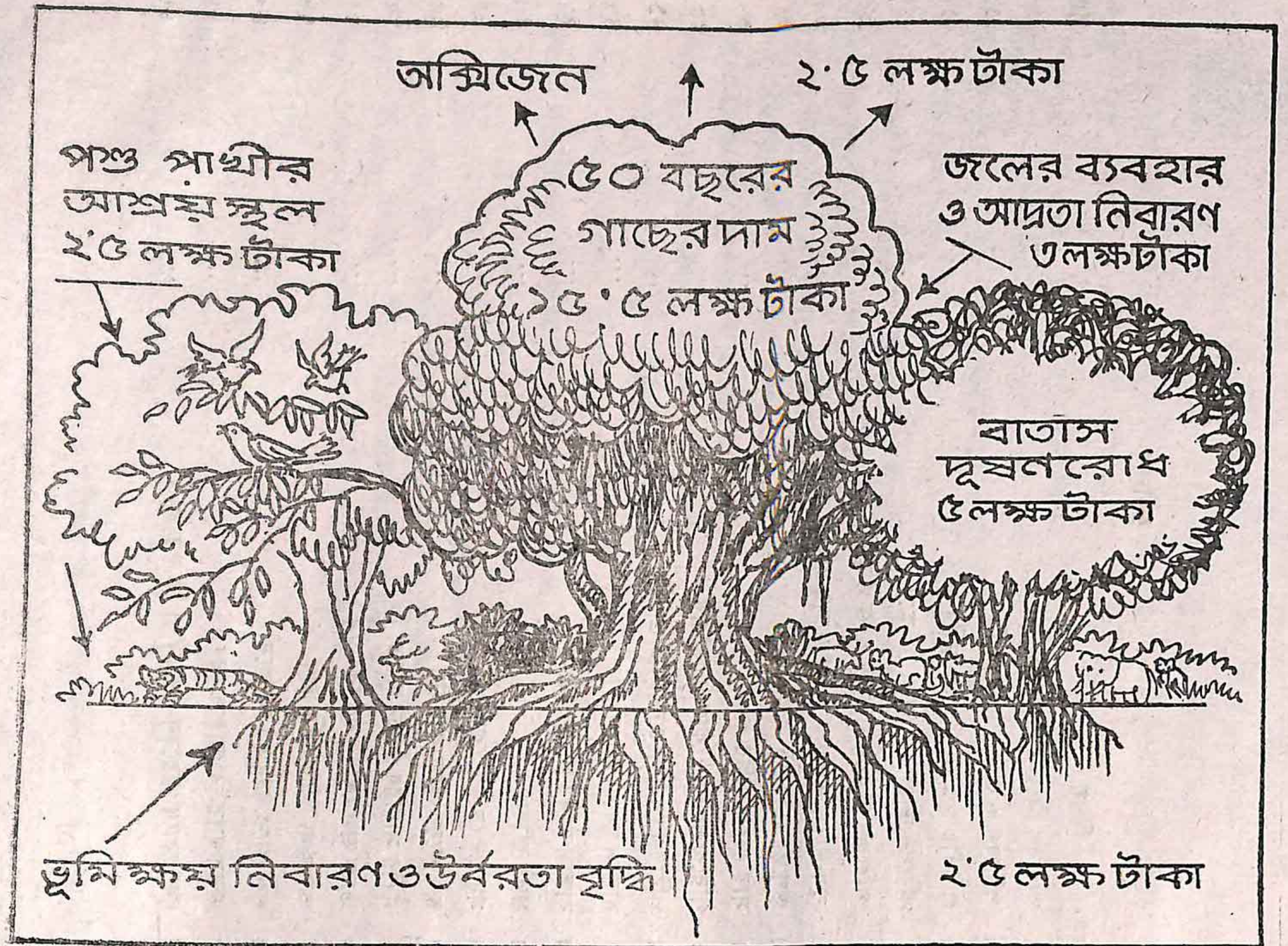
বর্তমান যুগোপযোগী বইটির জন্য লেখক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

সন্তোষ কুমার ঘোষাল

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩
নিউ সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১

জনস্বাস্থ্য কারিগরী এবং জল ও বায়ু প্রদূষণ নিবারণ উপদেষ্টা,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সূচীপত্র


অক্সিজেন
২·৫ লক্ষ টাকা
পশু পাখীর আশ্রয় স্থল ২·৫ লক্ষ টাকা
৫০ বছরের গাছের দাম ১৫·৫ লক্ষ টাকা
জলের ব্যবহার ও আদ্রতা নিবারণ ৩লক্ষটাকা
বাতাস দূষণ রোধ ৫লক্ষ টাকা
ভূমিক্ষয় নিবারণ ও উর্বরতা বৃদ্ধি
২·৫ লক্ষ টাকা

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা কেন ?

পরিবেশ কি, তাকে নিয়ে আজকাল এতসব চিন্তাভাবনা কেন, হয়ত একথাই তোমাদের সবার মনে আসবে। সত্যিই আজ থেকে এগার-বার বছর আগেও আমরা পরিবেশ নিয়ে কোন বিশেষ ভাবনা চিন্তাই করিনি এদেশে।

আগে মানুষ ভাবত মাথার ওপরে রয়েছে অনন্ত আকাশ, আকাশজুড়ে বাতাস। তাই সেই বিশাল বাতাসের ভাণ্ডারকে মানুষ খুশীমত নানান কাজে লাগাতে পারে। তাই কল-কারখানা বাষ্পীয় শকট, এমনতর নানান কাজে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খুশীমত বাতাসের ব্যবহার শুরু হল। মানুষ তখন ভাবছে, বিশ্বজুড়ে বাতাসের অফুরন্ত ভাণ্ডার, যত খুশী তাকে ব্যবহার করি, ক্ষতি কি ? কিন্তু মানুষ ভুলেই গেল নির্মল বাতাস না হলে মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ সবারই বিপদ। কিন্তু কথাটা ভুলেই নির্মল বাতাসের ঘাটতি ঘটতে লাগল। কল-কারখানা থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস আসতে লাগল। শহর বসতি থেকে আসা ধূলিকণা আকাশ ভরিয়ে দিল। নদী-নালা দূষিত হয়ে তার বিষাক্ত গ্যাস বাতাসকে বিষময় করে তুলল। ফলে, ক্রমেই অভাব ঘটতে লাগল নির্মল বাতাসের।

অথচ, আমাদের জন্য, এমনকি পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার, উদ্ভিদশ্রেণী সবারই চাই নির্মল বাতাস। দিনে প্রায় বাইশ হাজার বার আমরা শ্বাস গ্রহণ করি। মজার কথা কি জান, যখন বিশ্রাম করি তখন যতটা বাতাস টেনে নিই (সাড়ে দশ হাজার লিটার বাতাস) তারই প্রায় চার গুণ বাতাসের (চল্লিশ হাজার লিটার বাতাস) দরকার হয় প্রতিটি মানুষের রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময়। আর যখন দৌড়ঝাঁপ করি তখন প্রতিজন মানুষের দরকার হয় প্রায় ৬ গুণ (৬২ হাজার লিটার) বাতাসের। আজকের জনসমিষ্টির কথা ভেবে হিসাব করলে দেখা যাবে শুধু শ্বাস গ্রহণের জন্যই প্রতিদিনে আমাদের দরকার হয় ৩৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড নির্মল বাতাসের। কিন্তু সেই নির্মল বাতাসের ক্রমেই ঘাটতি হোতে লাগল আমাদেরই খেয়াল খুশীর জন্য।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি হোল। কলকারখানা সৃষ্টি হোল। জনসংখ্যা বাড়তে লাগল। তাদের বসবাসের জন্য নতুন নতুন শহর তৈরী হোল বন-জংগল কেটে। জনসংখ্যা বাড়ছে দেখে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা রাসায়নিক সার ব্যবহারের নানান কলাকৌশল বার করল, যাতে শস্যভাণ্ডার বাড়তে থাকে। মানুষ ভাবল সব কিছুরই বুঝি উন্নতি হোল। সামনে আর কোন সমস্যাই থাকল না।

আসলে কিন্তু এরই ফলে নানান বিপর্যয় আরম্ভ হল। মানুষ ভুলেই গেল কথাটা যে মাটি তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সার গ্রহণ করে না। বাড়তি সার মাটির তল দিয়ে জলতলের সংগে মিলেমিশে ধীরে ধীরে নদী-সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। ফলে নদীসমুদ্র বিষময় হয়ে উঠল।

এরই সঙ্গে কলকারখানা আর শহরাঞ্চল থেকে নানান ত্যক্ত বা বর্জ্য পদার্থ নদী-সমুদ্রে পড়ে তাদের দূষিত করে তুলতে লাগল। ফলে জলজ-গুল্ম, জলজ-প্রাণী হঠাৎ কমে যেতে লাগল।

এরই সংগে কলকারখানার দূষিত গ্যাস ও ধোঁয়া আকাশকে দূষিত করে তুলল। শহরাঞ্চলের উৎক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম পদার্থকণা আকাশ ভরিয়ে সৃষ্টি করল ধোঁয়াসা। বাতাসকে করে তুলল ভারী। কল-কারখানা, যানবাহনের ধোঁয়া-গ্যাস-শব্দ, সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী হোল।

সাথে সাথে, বনজংগল পরিষ্কার করে জনবসতি কলকারখানা তৈরী করার ফলে সৃষ্টি হোল বিরাট বিপর্যয়। গাছপালা কমে যাওয়ায়, পশুপাখী কমতে লাগল, খাদ্যভাণ্ডারে ঘাটতি হোল। পরিবেশে বিপর্যয় আরম্ভ হোল।

প্রথম প্রথম এই বিপর্যয় মানুষ খেয়ালই করে নি; কিন্তু এরকম চলতে চলতে হঠাৎ মানুষের খেয়াল হোল একদিন,—আরে! আজ-কাল শ্বাস নিতে এত কষ্ট হচ্ছে কেন? গাছ-গাছালী ক্রমেই কমে যাচ্ছে কেন? জীব-জন্তু পশু-পাখী, জলজ-গুল্ম, জলজ-প্রাণী ও মাছ অজান্তেই কমছে কেন?

সম্বিত ফিরল বিজ্ঞানীদের। সাড়া পড়ে গেল তাদের মধ্যে। সবাই বললেন,—খোঁজ, খোঁজ অপরাধী কে? কার জন্য এই সব বিপর্যয়? এমন ভাবে চলতে থাকলে যে বাঁচাই অসম্ভব হয়ে উঠবে? পশু-পাখী, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ, সব যে শেষ হয়ে যাবে।

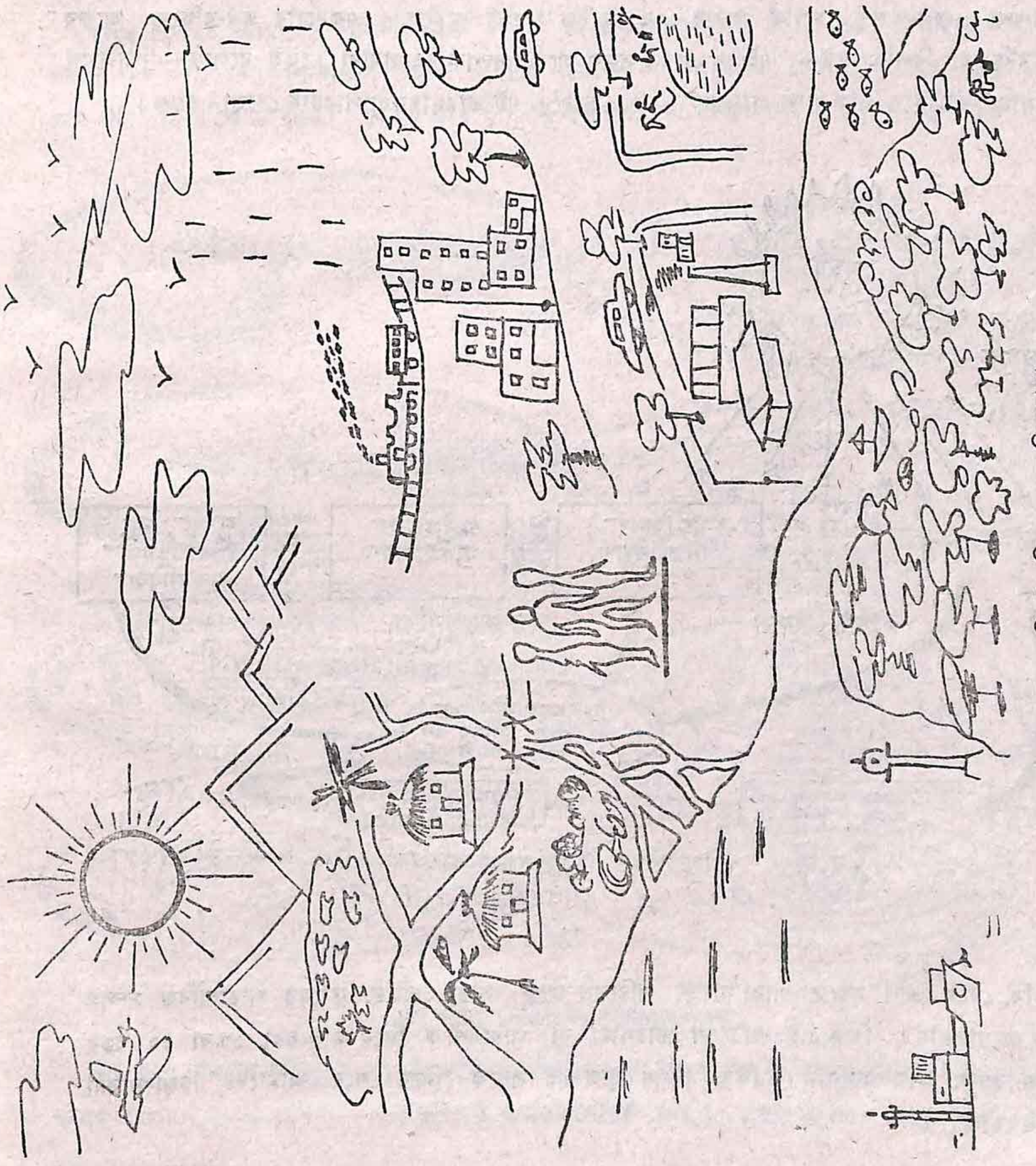
অনেক খোঁজাখুঁজির পর, চিন্তা-ভাবনার শেষে বিজ্ঞানীরা সবাই জড়ো হলেন ১৯৭২ সালের ৫ই জুন, সুইডেনের স্টকহলম শহরে। সবাই একসংগে বলে উঠলেন,—'পেয়েছি, পেয়েছি মানবজাতির প্রাণিজগতের, উদ্ভিদজগতের প্রধানতম শত্রুকে।' বিজ্ঞানীরা আরও বল্লেন, এই প্রধান শত্রু হচ্ছে—"দূষণ"। এই দূষণই পরিবেশকে বিষাক্ত করে সৃষ্টি করছে এই বিপর্যয়।

ব্যাস, সেই ৫ই জুন ১৯৭২ সালে, স্টকহলমে ঠিক হয়ে গেল, যে ভাবেই হোক পরিবেশকে রক্ষা করতেই হবে। আর সেজন্যই এরপর থেকে প্রতিবছর ৫ই জুন বিজ্ঞানীরা মিলিত হয়ে বিচার-বিবেচনা করতে শুরু করলেন কতটা দূষণ রোধের ব্যবস্থা হোল, আরও কি কি ব্যবস্থা করা দরকার, এই দূষণকে বন্ধ করার জন্য। এই ৫ই জুন তারিখকে সেজন্যই নাম দেওয়া হোল, "বিশ্ব-পরিবেশ দিবস", বা "ওয়ারল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে"। এ দিনেই বাৎসরিক সমীক্ষা হয় জল-বায়ু শব্দ-মাটিকে দূষণ-মুক্ত করতে কতটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আরও কতটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

পৃথিবী. জুড়ে পরিবেশকে নিয়ে সঠিকভাবে সজাগ হওয়া শুরু হোল এরপর থেকেই, সেই ৫ই জুন, ১৯৭২ সাল থেকেই।

পরিবেশ ও তার ভারসাম্য কি ?

আমাদের চারপাশে যা আমাদের ঘিরে আছে তাইই আমাদের পরিবেশ। যেমন, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, যে বাতাস থেকে প্রশ্বাস নিচ্ছি, যে নদ-নদী থেকে পানীয় জল আনছি, সামনের



১ নম্বর ছবি : পরিবেশ বলতে কি বোঝায়

গাছ-পালা, দূরের বনজংগল, পশু-পাখী, জন্তু-জানোয়ার, এমনকি দূরের নদ-নদী-সমুদ্র-পাহাড়, জড়-অজড় পদার্থ এদের সব নিয়েই তৈরী হয়েছে আমাদের পরিবেশ। ১নং ছবিটা দেখলেই পরিবেশ বলতে কি বোঝাচ্ছে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই যে চারপাশের যা কিছু আমাদের ঘিরে আছে, এদের সবার সংগে সবার, এমনকি মানুষ-জীব-জন্তু জড়-অজড় পদার্থ সবার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একদলের ক্ষয়-বৃদ্ধিতে অন্যের ক্ষয়-বৃদ্ধি বা বিপর্যয় ঘটে। এই যে একের সংগে অন্যের সম্পর্ক, বিজ্ঞানীরা একেই বলেছেন "পরিবেশ ভারসাম্য" বা "ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স"। ২নং ছবিতে এই ভারসাম্য ব্যাপারটাই বোঝান হচ্ছে।



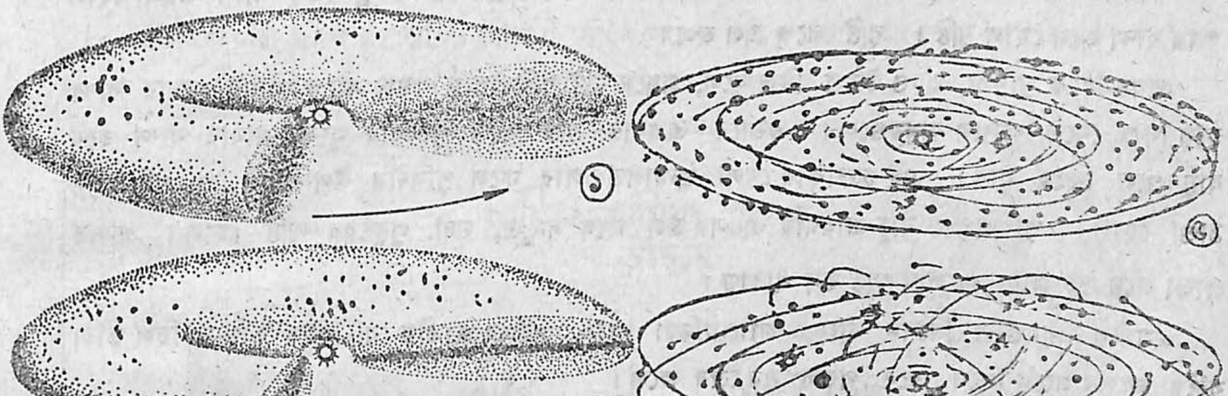
২নং ছবি : প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ছবি — উৎপাদক— ব্যবহারিক সম্পর্ক।

ছবি দেখে এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে, পরিবেশ জুড়ে যারা আছে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই পরিবেশ ভারসাম্য বা পরিবেশকে নিয়ে মানুষেরা ১১ বা ১২ বছর আগেও বিশেষ করে ভাবেনি। কিন্তু বিপদ বুঝে এই সবকে নিয়ে শেষে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতেই হোল।

পৃথিবীর জন্ম ও পরিবেশ সৃষ্টির কথা

পরিবেশ, তার ভারসাম্য, তার দূষণ, সব কিছুই বুঝতে গেলে আগে জানতে হবে, আমাদের এই পৃথিবীর জন্মের কথা। জানতে হবে, পাহাড়-নদী, আকাশ-বাতাস, জড়-অজড় পদার্থ নিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি হোল কি করে।

বলত প্রথমেই, আমাদের পৃথিবীর বয়স কত ? তা হবে প্রায় পাঁচশ কোটি বছর ; কিন্তু পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, আকাশ-বাতাস তৈরী হোয়ে আজকের এই পৃথিবীর চেহারা আসতে লেগেছিল প্রায় পাঁচ হাজার কোটি বছর। কেমন করে পৃথিবীর জন্ম হল, ৩নং ছবিতে সেটাই আগে দেখে নাও।



৩ নম্বর ছবিঃ পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের জন্ম

সূর্য যখন নিজ কেন্দ্রবিন্দুতে বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল তখন সূর্য থেকে কিছুটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে এসে সূর্যের চারপাশে ঘুরতে লাগল। ৩নং ছবির ১ ও ২তে সেটাই দেখছ। এই সময় সব কিছু ছিল তরল

জ্বলন্ত আগুনের গোলক। সূর্যের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে সেই আগুনের তরল গোলক আবার টুকরো টুকরো হয়ে গেল, আর সেই অবস্থাতেই ঘুরতে লাগল সূর্যের চারপাশে। সৃষ্টি হোল নানান গ্রহ উপগ্রহ, সৌরমণ্ডল। ৩, ৪, নং ছবি দেখ।

ছয় হাজার কোটি বছর আগে সূর্য থেকে ছিটকে আসা যে অংশ পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিল তার উত্তাপ ছিল প্রচণ্ড (পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার সেন্টিগ্রেড)। গ্যাস, বাষ্প, নানান গলিত মৌলিক পদার্থ নিয়ে ছিল সেই পৃথিবী। তখন না ছিল নদী-পাহাড়, না ছিল শক্ত মাটি, না ছিল বাতাস কোন কিছু।

তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হোতে লাগল। তাপ কমার ফলে কিছু কিছু গ্যাস তরল হোল আর বাষ্প জমে হোল বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে এল জল।

প্রথম দিকে পৃথিবী প্রচণ্ড উত্তপ্ত ছিল বলে, প্রথমে বৃষ্টি পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ার সংগে সংগেই আবার বাষ্প হয়ে ফিরে যেতে লাগল বায়ুমণ্ডলে। এভাবে একবার বৃষ্টি পড়ে পৃথিবীর বুকে আবার বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এই চক্রাকার খেলা ক্রমাগত চলার ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ বা পৃথিবীপৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হোল। পৃথিবীপৃষ্ঠে নীচু জায়গায় এরপর জল জমে সমুদ্র, নদী, পুকুরের সৃষ্টি হোল। গলিত লাভা জমে উচু জায়গাগুলোয় সৃষ্টি হল পাহাড়।

এসময়ে বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাস, অ্যামোনিয়া গ্যাস, এইসব জাতীয় যে গ্যাস ছড়িয়ে ছিল তারা বৃষ্টির জলের সংগে মিশে এসে পড়ল সমুদ্রের জলে।

এভাবেই আরো তিন হাজার কোটি বছর কেটে গেল। তখন, অর্থাৎ তিন হাজার কোটি বছর আগের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন ছিল না। বায়ুমণ্ডলে তখন ছিল মিথেন গ্যাস, অ্যামোনিয়া গ্যাস, আর হাইড্রোজেন গ্যাস। বায়ুমণ্ডল ছিল স্বচ্ছ হালকা। ফলেই, সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের স্তর সহজে ভেদ করে বেশী মাত্রায় সূর্যকিরণ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ত। পৃথিবীপৃষ্ঠে এই উত্তাপের মধ্যে কোনও গাছপালা বা প্রাণীর আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। তাই সে সময়ে পরিবেশ বলতে কিছুই ছিল না।

ক্রমে পৃথিবীর উত্তাপ আরও কমে এল (৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে উত্তাপ ১০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে এল)। প্রাণ সৃষ্টির মত পরিবেশ সৃষ্টি হোল। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আদিকোষ সৃষ্টির সূচনা হোল।

প্রথম দিকে নতুন সৃষ্ট কোষগুলো জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতো উচ্চশক্তি যুক্ত রাসায়নিক পদার্থকে ভেঙে ভেঙে। ক্রমে এই উচ্চশক্তিযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ কমতে লাগল। তখন কিছু কিছু কোষ সূর্যশক্তি আহরণ করে জীবনধারণ শুরু করল। এভাবে দেখা গেল, যেসব কোষ সূর্যশক্তির সাহায্যে বাঁচতে লাগল তাদের রং হোল সবুজ। কারণ যেসব কোষে সূর্যশক্তি সঞ্চয় হোত তাদের রঙ ছিল সবুজ। এই সবুজ রঙযুক্ত কোষগুলোকে বলা হোল ক্লোরোফিলযুক্ত কোষ।

এই সবুজ ক্লোরোফিলযুক্ত কোষ সালোক-সংশ্লেষের সাহায্যে নিজেদের পুষ্ট করে বাড়তে লাগল, আর এই প্রক্রিয়ার সময় প্রচুরভাবে মুক্ত অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হোল। এই মুক্ত অক্সিজেন প্রাচীন-কালের বায়ুমণ্ডলে যেসব অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে ছিল, তাদের সংগে মিশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন সৃষ্টি করল। এভাবে আদি বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হোল, যার মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাওয়া গেল।

এভাবে বিবর্তন হোতে হোতে, ক্লোরোফিলযুক্ত কোষ জন্ম দিল আজকের উদ্ভিদ জগতের, আর ক্লোরোফিলহীন কোষ সৃষ্টি করল এই প্রাণিজগতের।

সময়ের বিবর্তন হোতে হোতে পৃথিবীর বয়স যত বাড়তে লাগল ততই দেখা গেল সরল দেহধারী জীব উন্নত জটিল দেহধারী জীবে রূপান্তরিত হোল। সংগে সংগে উদ্ভিত জগতের চেহারারও পরিবর্তন হোতে লাগল। প্রাচীন যুগের মস, ফার্ণ কি বিরাট ছিল, দেখ ৪ নম্বর ছবিতে।



৪নং ছবি : ! প্রাচীন যুগের সরল উদ্ভিদ

সারণী নং ১ঃ **পৃথিবীর যুগ বিবর্তন**

যুগ	কত কোটি বছরে	এই যুগে পৃথিবীর অবস্থাটা কেমন ছিল
প্রাণহীন যুগ (অ্যাজোয়িক)	৩০০ কোটি	এ যুগে কোনও উদ্ভিদ, প্রাণী, বা প্রাণ ছিল না। পৃথিবী পৃষ্ঠের উত্তাপ ৬০০০° সেন্টিগ্রেড থেকে নেমে এল ৩০০০° সেন্টিগ্রেডে।
প্রাণময় যুগ	২০০ কোটি	নীচের ক, খ, গ, ঘ দেখ
(ক) প্রিক্যামব্রিয়ান (আদিমতম প্রাণময় যুগ)	১৫০ কোটি	আদিমতম উদ্ভিদের সৃষ্টি হোল। আজ তাদের কোনও অস্তিত্বই নেই। পৃথিবীপৃষ্ঠের উত্তাপ নেমে এল ১০০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।
(খ) প্যালিওজইক যুগ (আদিমতম প্রাণময় যুগ)	৩০ কোটি	আদিম জীবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। শৈবাল, মস, ফার্ণের উদ্ভব হল। জল থেকে উৎপন্ন হোতে লাগল স্থলজ উদ্ভিদ। এ সময়ে আবহাওয়া ছিল স্যাঁতস্যাঁতে, উষ্ণ, জলকাদায় ভর্তি।
(গ) মেসোজইক (প্রাণময় মধ্য যুগ)	১৩ কোটি	এ সময়ে ভূগর্ভের বিরাট আলোড়নে সৃষ্টি হোল পাহাড়, উত্তর আমেরিকার পর্বতমালা। নগ্নবীজী উদ্ভিদ (যেমন খেজুর জাতীয় গাছের), বা সাইকান গোত্রীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হোল। আবহাওয়ায় শীত-গ্রীষ্মের তফাৎ ছিল না এই যুগে।
(ঘ) কোয়েনজইক (বর্তমান যুগ)	৭·৫ কোটি	ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন হোল। সৃষ্টি হোল এশিয়ার পর্বতমালা হিমালয়, ইউরোপের আল্পস্, উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালা, দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাণ্ড্স পর্বতমালা। বিভিন্ন ঋতু, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি দেখা দিল। গুপ্তবীজী উদ্ভিদ সৃষ্টি হোল। ৬০,০০০ উদ্ভিদ জন্মাল।

দেখলে তাহলে, পৃথিবী শীতল হোতে কয়েক কোটি বছর কেটে গেল। প্রথম তিনশ কোটি বছরে জীবন-ধারণের বা উদ্ভিদজগত সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়নি। এই জীবনহীন প্রথম ৩০০ কোটি বছরকে নাম দেওয়া হোল প্রাণহীনযুগ বা অ্যাজোয়িক যুগ।

এর পরে, শেষের ২০০ কোটি বছরে প্রাণের আবির্ভাব হোল। এই যুগকে বলা হোল প্রাণময় যুগ বা প্রিক্যামব্রিয়ান মেসেজোইক যুগ। এই যুগে প্রথমে আবির্ভাব হোল উদ্ভিদের। সূর্য থেকে আলো—শক্তি নিয়ে বাঁচার কায়দাটা প্রথম রপ্ত করেছিল উদ্ভিদরাই। তারপর এল প্রাণিজগত। উদ্ভিদদের সৃষ্টি করা জৈব খাদ্য খেয়ে প্রাণিজগত নিজেদের বাঁচিয়ে রাখল। এভাবে সৃষ্টি হোল খাদ্য-খাদকের শৃঙ্খলচক্র বা পরিবেশ-ভারসাম্যের বন্ধন চক্র।

এই প্রসংগে জেনে রাখ, পৃথিবীর জন্মের শেষ ২০০ কোটি বছরের সময়ে যেসব উদ্ভিদ-গুল্ম সৃষ্টি হয়েছিল তারা অক্সিজেন ছাড়াই বাঁচত, কারণ সেই সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কোন অক্সিজেনই ছিল না। ক্রমে মুক্ত অক্সিজেন এল বায়ুমণ্ডলে, অক্সিজেন সংযোগে নানান ধরনের জটিল উদ্ভিদের সৃষ্টি হোল।

এভাবে পৃথিবীর আজকের পরিবেশ, আকাশ, বাতাস, মাটি, নদী-সমুদ্র, বনজংগল, পশু-পাখী, জন্তু-জানোয়ার সব সৃষ্টি হোল। এসব কিছু বুঝে নাও ১৬ পাতার ১ নম্বর সারণীতে।

এভাবে যে পৃথিবীর পরিবেশ সৃষ্টি হোল, যে প্রাণময় যুগের দেখা পাওয়া গেল, তার মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগই হোল উদ্ভিদ শ্রেণী, আর শতকরা ১ ভাগ হোল প্রাণী। শতকরা এই ১ ভাগ প্রাণী বেঁচে আছে ঐ শতকরা ৯৯ ভাগ উদ্ভিদের ওপর।

এর মধ্যে আবার সবুজ উদ্ভিদই সৌর শক্তিকে আটকিয়ে জৈব গ্লুকোজ তৈরী করে। এই ক্ষমতা সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া আর কারুরই নেই। তাই সবুজ উদ্ভিদ জগতকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব প্রাণিজগতের, বিশেষ করে মনুষ্যজাতির। আর সেজন্যই এসবকে নিয়ে যে পরিবেশ, তাকে সঠিক সুর বেঁধে রাখার দায়িত্ব তোমাদের, আমাদের।

পরিবেশ ভারসাম্য আসে কি করে ?

পৃথিবী তার জন্মের শেষ দুশো কোটি বছরে, অর্থাৎ প্রাণময় যুগে, সার্কাসের ব্যালেন্সের মত খেলা করে উদ্ভিদ, প্রাণী, জল, নানান মৌলিক পদার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য আনছে। ফলে, একদিকে এই যে পরিবেশ আর অন্যদিকে জনসংখ্যা বিস্তার, তাকে স্থিতিশীল করছে পরিবেশ ভারসাম্যতা। নতুন নতুন অঞ্চল, বসতি, বিজ্ঞানের প্রগতি এমন ভাবে হওয়া উচিত যাতে এই সামঞ্জস্য বজায় থাকে। এ যেন দড়ি টানাটানি খেলার মত। ৫ নং ছবিটা দেখ একবার ব্যাপারটা বোঝার জন্যে।

ছবি দেখলেই বুঝবে জোগানদার দল আর ব্যবহারী দলের মধ্যে সমান দুধারে টান থাকলে ভারসাম্য বিন্দু বজায় থাকবে, না হলে, ব্যবহারীদের সংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেলে, তারা জিতে যাবে, অর্থাৎ টান পড়বে

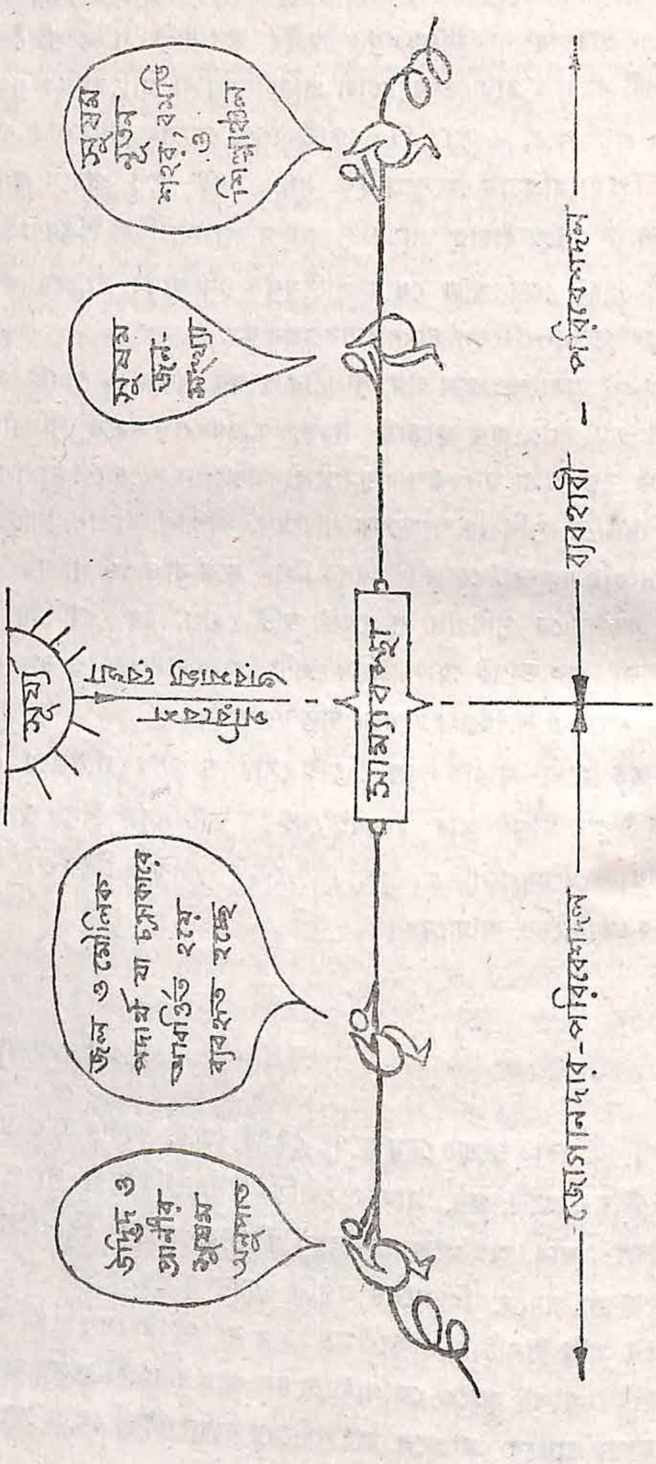
জোগানদার পরিবেশ দলে। ভারসাম্য রেখা বজায় থাকবে না। আবার অত্যধিক জোগানদার পরিবেশ দল তৈরী হলে, তার উপযোগী ব্যবহারিক না থাকলেও নষ্ট হবে ভারসাম্য রেখা। আর সূর্য যেন রেফারী।

অর্থাৎ ভারসাম্য রেখাকে নিজের জায়গায় রাখতে হলে চাই জল-স্থল-বায়ু-শব্দের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। কিন্তু সেই ভারসাম্যকে ভালভাবে বুঝতে গেলে জানতে হবে এদের কে কার ওপর কতটা নির্ভরশীল।

এটা বুঝতে ৬ নম্বর ছবিটা দেখ। প্রকৃতি কেমন করে সূর্য থেকে আলো টেনে নিয়ে উদ্ভিদ-প্রাণিজগতের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করছে বোঝা সেটা। ২নং ছবিও এই সংগে দেখ।

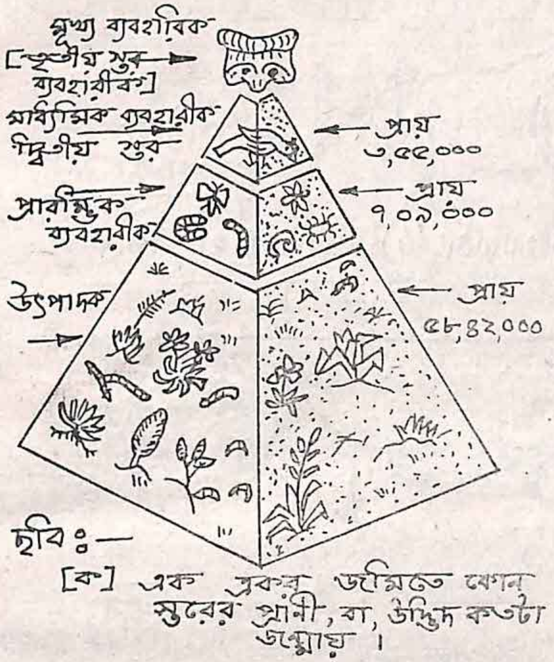
সূর্যের আলো থেকে সৃষ্টি হোল আপনা থেকেই ছোট ছোট গুল্ম, লতা-পাতা। এই লতাপাতা গাছপালাকে বলা হোল মূল উৎপাদক বা প্রডিউসার। এরাই পরিবেশ রক্ষার মধ্যমণি বা মূলকেন্দ্র।

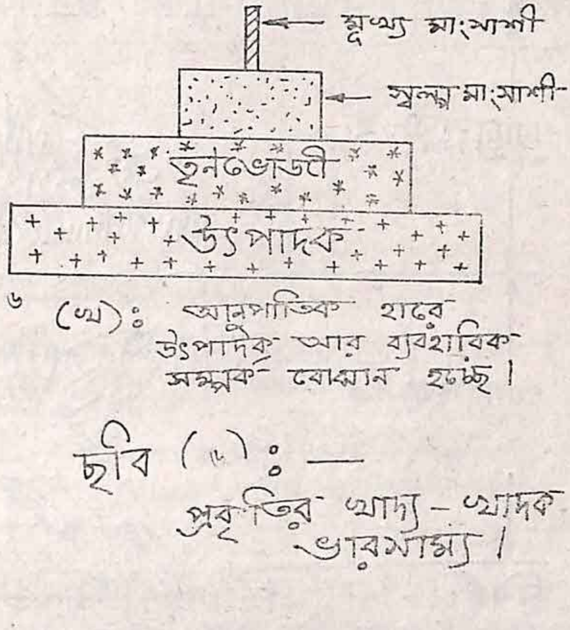
তৃণ-উদ্ভিদ খেয়ে খেয়ে যারা বাঁচল, তারাই হোল প্রাথমিক ব্যবহারিক বা প্রাইমারী প্রডিউসার। যেমন খরগোস, ছাগল, গরু, ভেড়া ইত্যাদি। এদের হার্বিভারাস বা তৃণভোজীও বলা হয়।



৫নং ছবি : পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য যেন চলছে দড়ি টানাটানি

এই প্রাথমিক ব্যবহারিকদের খাদ্য হিসাব খেয়েযারা বাঁচে তারা হোল মাধ্যমিক ব্যবহারিক বা সেকেণ্ডারী কনসিউমার। এদের আবার অন্য ভাবে বলা হল স্বল্প মাংসাশী প্রাণী বা মাইনর কার্নিভোরাস। মাছ, পাখী, বন বেড়াল ইত্যাদি এই দলে পড়ে।





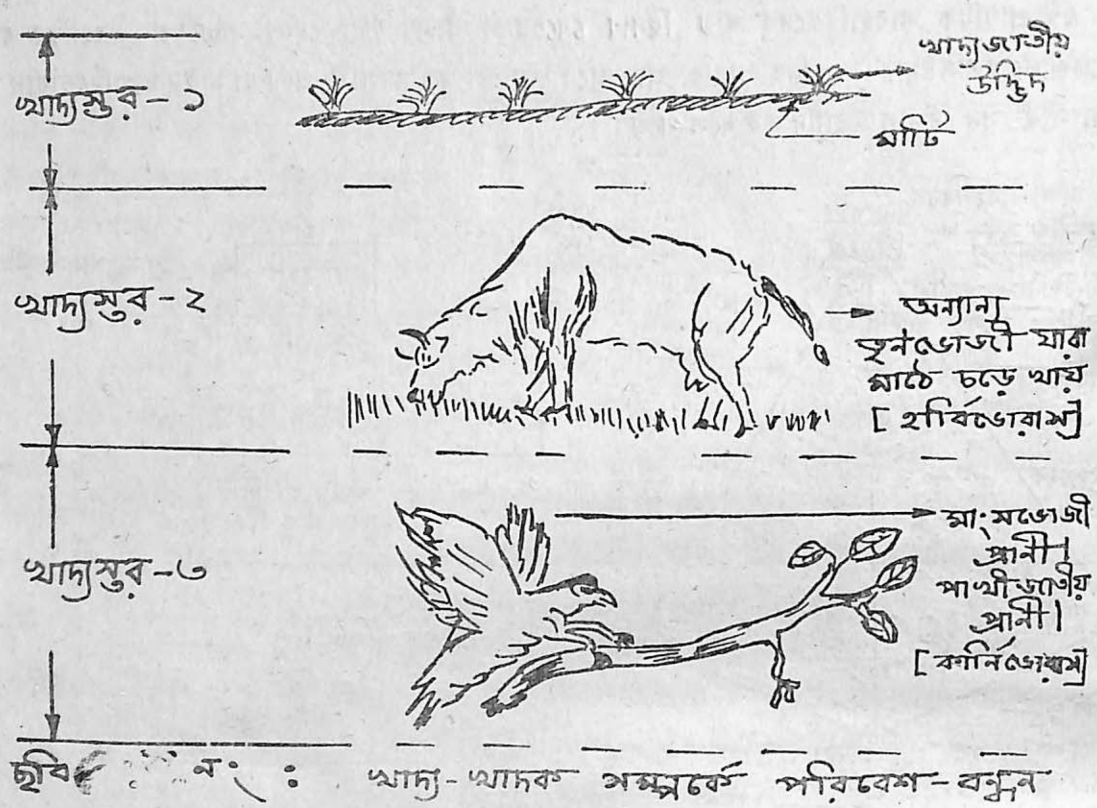
৬নং ছবি ঃ প্রকৃতির খাদ্য-খাদক ভারসাম্য

আবার এই মাধ্যমিক ব্যবহারিকদের খেয়ে যারা বাঁচে তাদের বলা হল মুখ্য ব্যবহারিক বা টারটিয়ারী কনসিউমার। বাঘ, সিংহ, এরা এই দলে পড়ে।

খাদ্য খাদকের এই সম্পর্ক, যা পরিবেশের মধ্যে সুষম বন্ধন শৃঙ্খলা আনে, তাকে বিজ্ঞানীরা বলেন খাদ্য শৃঙ্খল বা ফুড চেইন। খাদ্য-শৃঙ্খল কিভাবে কাজ করে বুঝে নাও। সূর্যের আলো থেকে যে সব তৃণ, গুল্ম আপনা আপনি জন্মায়, তাকে বলে উৎপাদক। এই উৎপাদক স্তরের খাদ্য খেয়ে যারা বাঁচছে তারা সৃষ্টি করছে প্রথম স্তরের খাদকদের বা তৃণভোজীদের। প্রথম স্তরের খাদকদের খেয়ে বাঁচছে দ্বিতীয় স্তরের খাদকরা বা স্বল্প মাংসাশী প্রাণীরা। আর সবশেষে এই দ্বিতীয় স্তরের খাদকদের খেয়ে বাঁচে তৃতীয় স্তরের খাদকরা, যেমন মানুষ, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি। ৭নং ছবি দেখ।

এই খাদ্য শৃঙ্খলের কোনও স্তরের খাদক সংখ্যা কমে গেলে, অন্য স্তরের খাদক সংখ্যাও কমে যাবে। ফলে শৃঙ্খল বা চেইনের সেখানেরই জোড়াই এর বন্ধন ভেঙে যাবে। শৃঙ্খল বা চেইন নষ্ট হয়ে পরিবেশ ভারসাম্যে বিশৃঙ্খলা আসবে। ৮নং ছবিতে তা দেখান হল।

খাদ্য শৃঙ্খল যেমন এক খাদ্যস্তর থেকে অন্য খাদ্য স্তরের সম্পর্ক রাখছে, তেমনি আবার, এই খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে খাদ্য-খাদকদল মারা গেলে বা বিনষ্ট হলে, তাদের ধ্বংসাবশেষ মাটিতে পড়ে।



৭নং ছবি : খাদ্য-শৃঙ্খল ও খাদ্য-খাদক সম্পর্ক

সময়ের সঙ্গে, আলো-বাতাসের সঙ্গে মিলেমিশে, এই ধ্বংসাবশেষের রূপান্তর ঘটে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বলে বিযোজক প্রথা। এই বিযোজক প্রথায় ধ্বংসাবশেষগুলো রূপান্তরিত হয়ে মূল পদার্থে বা মূল উপাদানে ফিরে আসে। এই মূল উপাদান থেকেই সৃষ্টি হয় আবার উৎপাদক গোষ্ঠীরা। পরিবেশে ভারসাম্য এভাবেই আসছে।

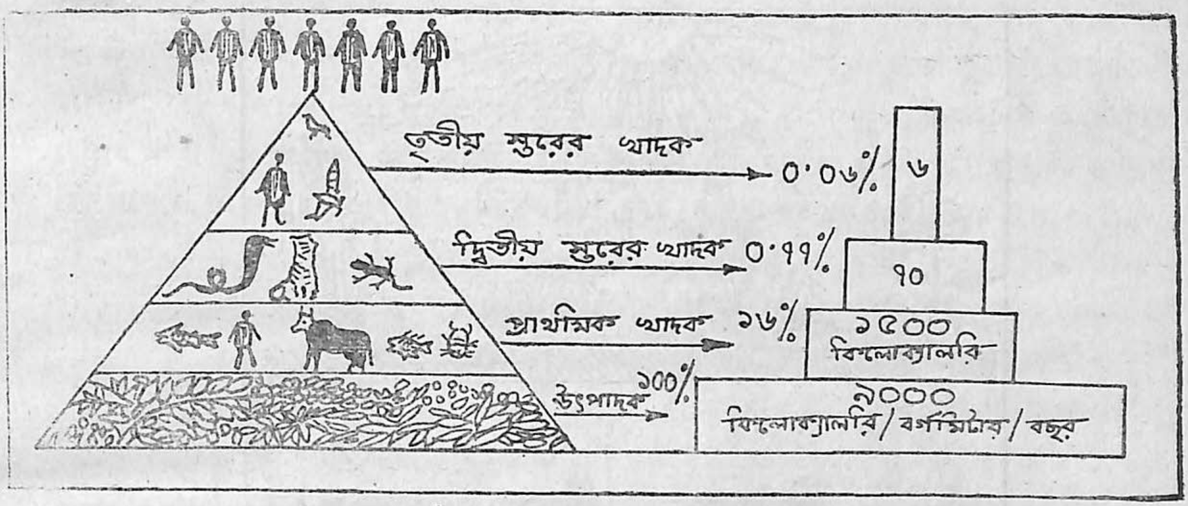
এভাবেই মূল উৎপাদক থেকে নানান খাদ্যস্তর সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের ধ্বংসাবশেষ, আলো-বাতাসে রূপান্তরিত হচ্ছে, শেষে আবার মূল উৎপাদকে ফিরে আসছে। এই মূল উৎপাদক সূর্যরশ্মির প্রভাবে, মাটির জল আর বাতাসের অক্সিজেনের প্রভাবে বেড়ে উঠছে। এই পরিবেশের চক্রাকার বিবর্তন বা পরিবেশের ভারসাম্য।

এসব কথা থেকে বুঝতে পারছ, মূল উৎপাদককে সঠিক অবস্থায় রাখতে যদি চাও, তবে দরকার প্রয়োজনীয় সবুজ আচ্ছাদন, যা সূর্য উত্তাপ গ্রহণ করে ক্লোরোফিলের সাহায্যে শক্তি জোগায়। প্রতিদিন পৃথিবীতে মানুষের জনসংখ্যা বাড়ছেই, প্রায় ১ লক্ষ ৮৭ হাজার করে। সেজন্য সবুজ বনানী সবুজ আচ্ছাদনও সেই অনুপাতে বাড়ান দরকার। কিন্তু হচ্ছে কি তাই? আসলে হচ্ছে উল্টোটাই। বন-জংগল কমতেই থাকছে।

হিসাব নিলে দেখা যাবে, ১০০ বছর আগে পৃথিবীর স্থলভাগে যতটা অংশে সবুজ ছিল, আজ

১০০ বছর পরে, তার ২৫ শতাংশ ভাগ কমে গেছে। অথচ জনসংখ্যা ১০০ বছরে বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সবুজ বনানীর ঘাটতি অনেকটা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

শহর গড়তে গিয়ে আমরা যখন গাছপালা কেটে ফেললাম বা তৃণজগত নির্মূল করে ফেললাম, তখন মূল উৎপাদকদের, প্রার্থমিক ব্যবহারিকদের সংখ্যা কমে গেল। ফলে মাধ্যমিক ব্যবহারিক বা দ্বিতীয় স্তরের



৮নং ছবি : পরিবেশ সাম্যের শৃঙ্খল বন্ধন বা পিরামিড

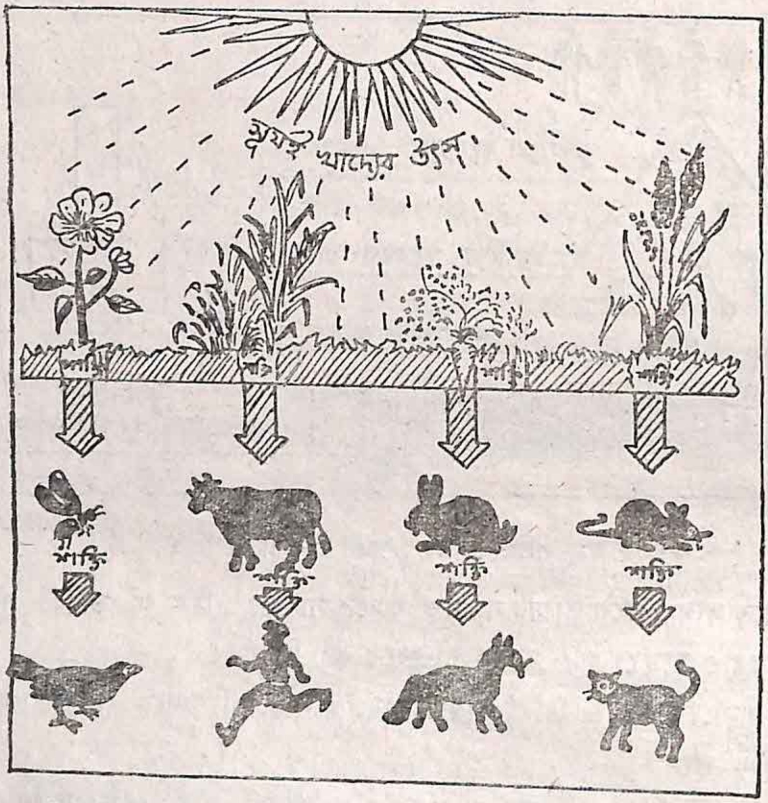
খাদকরা কম খাদ্য পেতে লাগল, ফলে তাদের সংখ্যাও কমতে লাগল। ঠিক এ ভাবেই মূল ব্যবহারিক বা তৃতীয় স্তরের খাদকরাও কমে গেল। ফলেই পরিবেশে এল বিপর্যয়।

সেজন্যই তো বিজ্ঞানীদের, প্রযুক্তিবিদদের ভাববার সময় এসেছে, পরিবেশকে রক্ষা করা যায় কি করে? একথা চিন্তা করার সময় এখন।

অথচ এক বর্গমিটার জমিতে সবুজ উদ্ভিদ থাকলে, সারা বছরে, তারা সৌরবিকিরণ থেকে ৯০০০ কিলোক্যালোরী শক্তি সংগ্রহ করতে পারা যেতো।

পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় সবুজ উদ্ভিদ

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসছে, সূর্যের আলো থেকে মূল উৎপাদক তৈরী হচ্ছে কিভাবে ? তার থেকে শক্তি আসছে কিভাবে ? সেজন্যই দেখ ৯ নং ছবিটা ।



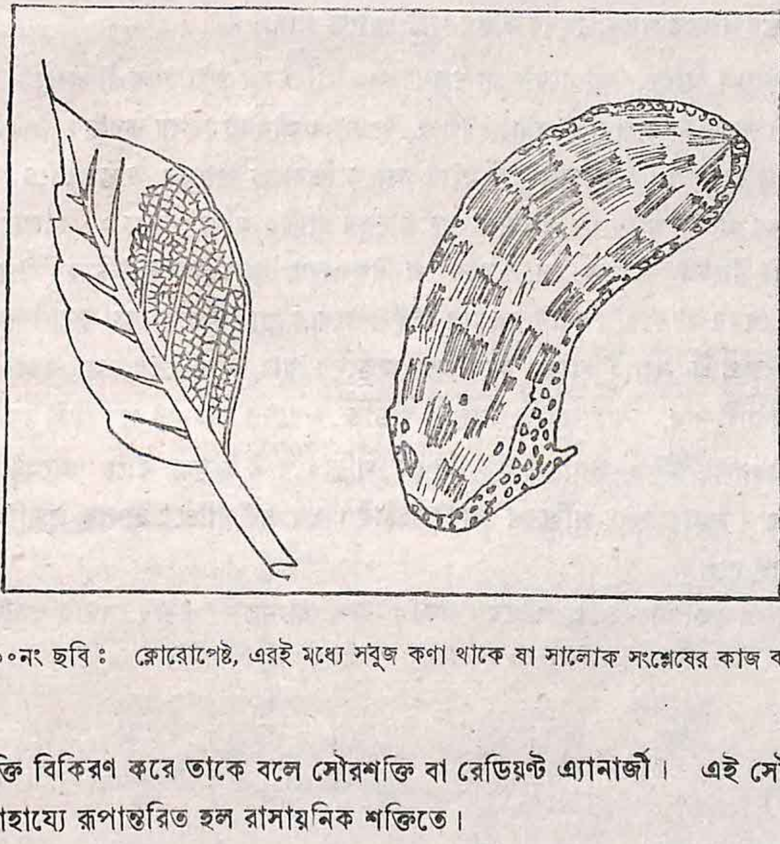
৯নং ছবি : সূর্যের আলো থেকে মূল উৎপাদক ও ব্যবহারিকরা কেমন করে শক্তি পায়

সূর্যের আলো ভূপৃষ্ঠের গাছ-গাছালির ওপর এসে পড়ার সংগে সংগে সংযুক্ত হচ্ছে কার্বন-মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রক, আর উদ্ভিদের পুষ্টিকারক দ্রব্য । এসব মিলেমিশে যে কাজ-কারবার হয় সবুজ পাতায়, তাকেই বলে সালোক সংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস ।

এতটুকু পড়ে ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পারছ না, তাইতো ? তাহলে, আরও সহজ করে বলি কথাটা। সবুজ পাতাযুক্ত গাছে এই সালোক-সংশ্লেষণ কাজটা অনেকটা কণ্ট্রোল গেটের মত। সূর্যের আলো সবুজ পাতায় পড়তেই, পাতার পত্ররন্ধ্র বা ·খুব সূক্ষ্ম ফুটোগুলোর মুখ খুলে যায়। আবার যেই সূর্যের আলো মিলিয়ে যায়, আপনা থেকেই পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।

পত্ররন্ধ্র যখন সূর্যের আলোয় খুলে যায় তখন সেই সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়ে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাতার মধ্যে প্রবেশ করে।

এদিকে গাছের পাতার মধ্যে থাকে কোরোফিল নামে এক সবুজ রঙএর অনুঘটক পদার্থ। এই অনুঘটক ক্লোরোফিল সূর্য থেকে নেমে আসা প্রচণ্ড তেজোরাশির কিছু কিছু অংশ শুষে নিয়ে আটকে ফেলে। এই আটক করা অমূল্য কণাটির নাম ফোটন। আটক কণা ফোটন, আর সবুজ পাতার অনুঘটক ক্লোরোফিল, পাতার কোষের মধ্যে সবুজ রঙ-এর ছোট্ট বোতামের মতো চেহারার ক্লোরোপেষ্টের মধ্যে নিঃশব্দে কাজ শুরু করে। শুরু হয় কম্পন আর মন্থন। ধাপে ধাপে রাসায়নিক প্রক্রিয়া শেষে বেরিয়ে আসে গ্লুকোজ, সাদা কথায় টাটকা চিনির উপাদান, আর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে অতিরিক্ত অক্সিজেন। ক্লোরোপেষ্টের কাজ-কারবার বুঝতে ১০ নম্বর ছবিটা দেখ। ছবিটা খুব বড় করে দেখান হোল।



১০নং ছবি : ক্লোরোপেষ্ট, এরই মধ্যে সবুজ কণা থাকে যা সালোক সংশ্লেষের কাজ করে

সূর্য যে শক্তি বিকিরণ করে তাকে বলে সৌরশক্তি বা রেডিয়ন্ট এ্যানার্জী। এই সৌরশক্তি ধীরে ধীরে সবুজ পাতার সাহায্যে রূপান্তরিত হল রাসায়নিক শক্তিতে।

এ সময়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রচুর অক্সিজেন গ্যাস উপজাত হয়। উদ্ভিদ যেটুকু দরকার সেটুকুই গ্রহণ করে। আর বেশীরভাগ অক্সিজেনই যা গাছের কাছে অতিরিক্ত, তা বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এই উৎক্ষিপ্ত অক্সিজেনের সংযোগে বাতাস শোধিত নির্মল হয়ে ওঠে। এমনি ভাবেই পশুপাখী, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, সবার উপযোগী অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

আগেই বলেছি, পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হয়েছে আজ থেকে ২০০ কোটি বছর আগে। কিন্তু কেমন

করে ? সঠিক এর উত্তর বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এখনও পর্যন্ত তাঁরা যা বললেন, অনেকটাই যুক্তি আর সম্ভাবনার কথা। তবে একটা কথা প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন, অতীতে পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব উদ্ভিদের মধ্য দিয়েই। উদ্ভিদই সূর্য থেকে আলো—শক্তি নিয়ে বাঁচার কায়দাটা রপ্ত করেছিল। এরপর এল প্রাণীরা, যারা উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বাঁচতে লাগল। অর্থাৎ, সেই যুগে উদ্ভিদ যদি না থাকত প্রাণিজগতও সৃষ্টি হোত না।

আরও আশ্চর্যের কথা কি জান ? পৃথিবীর আদিমতম বাতাসে কিন্তু কোনও অক্সিজেন ছিল না। তাই আজ থেকে দুশো কোটি বছর আগে যেসব উদ্ভিদ গুল্ম সৃষ্টি হয়েছিল তারা অক্সিজেন ছাড়াই বাঁচতে পারত। অক্সিজেন ছাড়া যে সব গুল্ম-গাছ বাঁচতে পারত, তারাই প্রথমে সালোক সংশ্লেষ ক্রিয়ার ফলে বাতাসে উদ্বৃত্ত অক্সিজেন ছাড়তে লাগল। ক্রমে বাতাসে অক্সিজেনে ভরপুর হয়ে উঠল। এরপর অক্সিজেন গ্রহণ করে যেসব উদ্ভিদ বাঁচতে পারে, সেসব উদ্ভিদ সৃষ্টি হোতে লাগল।

তাহলে এটুকু বুঝতেই পারছ, আমাদের প্রাণিজগতের আদিমতম স্রষ্টা হচ্ছে উদ্ভিদরা। তাদের ওপর আক্রমণ করে আমরা সভ্যতার অগ্রগতি দেখাতে গিয়ে নিজেদের জীবনই বিপন্ন করছি। তাই নয় কি ?

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখ, আজকে পৃথিবীতে মোট সাড়ে তিনলক্ষ জাতের উদ্ভিদ বেঁচে আছে। আর প্রায় দশ লক্ষ জাতের প্রাণী আছে। এই দশ লক্ষ জাতের প্রাণীর মধ্যে ৭ লক্ষ ২২ হাজার জাতের প্রাণী শুধু উদ্ভিদ তৃণ খেয়েই বাঁচে। বলতে গেলে বৃহৎ প্রাণিজগতের অধিকাংশই উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এ জন্যই অরণ্য রক্ষা যেমন দরকার, তেমনি দরকার সেই অরণ্যের প্রাণীকুলকে রক্ষা করা।

ঠিক সে জন্যই 'বন্যপ্রাণী সপ্তাহ' পালন করে, বন্য জন্তুদের প্রাণ ও পরিবেশ রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। অনেকের ধারণা বন্যপ্রাণী বাঘ, সিংহ, হাতি, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুদের রক্ষারই শুধু চেষ্টা হয়। তা নয়, যে পরিবেশে অর্থাৎ গাছপালা, উদ্ভিদ, জলাশয় ইত্যাদি যে পরিবেশে ঐ জন্তুরা বাঁচে তাদের রক্ষারও চেষ্টা হয়। অর্থাৎ খাদ্যশৃঙ্খল রক্ষার চেষ্টা, পরিবেশ রক্ষার চেষ্টাই। হয় এই বাঁচিয়ে রাখার লড়াইকেই পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার লড়াই বলে।

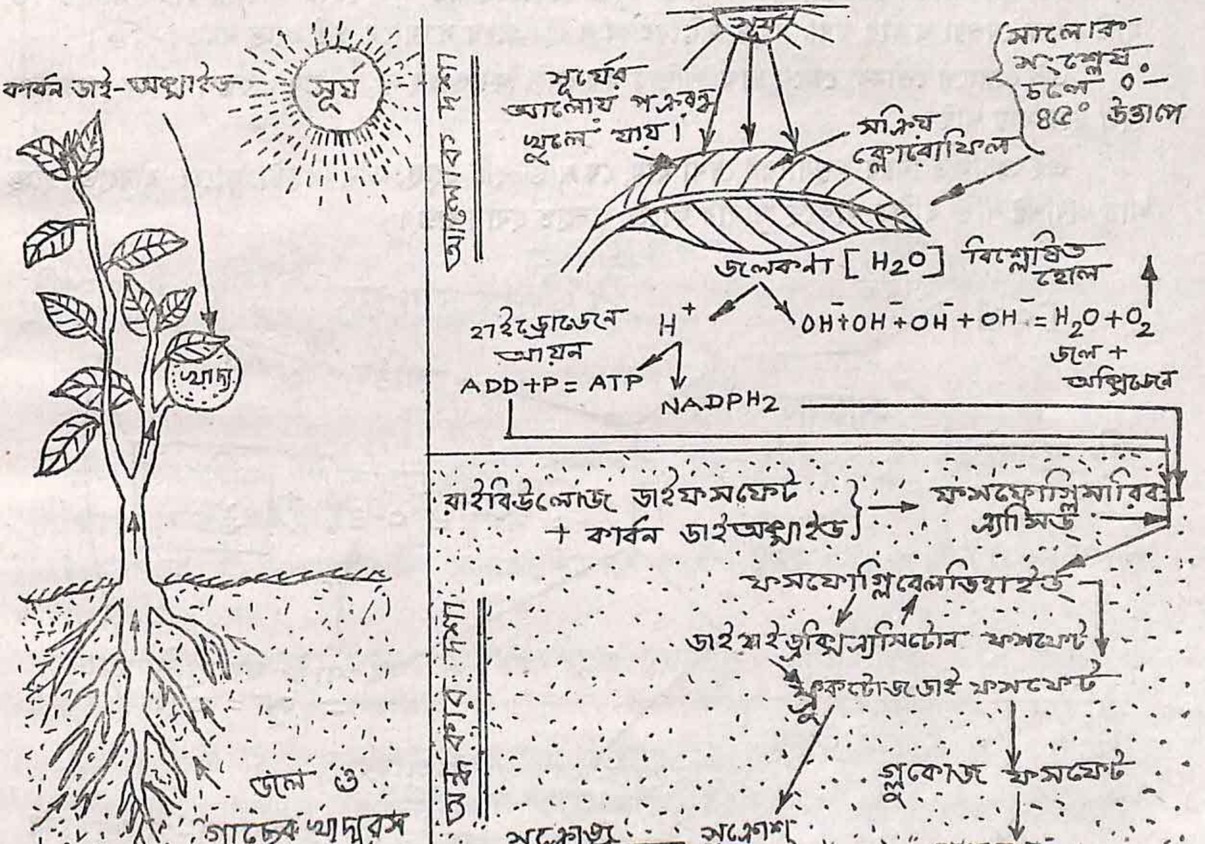
কিন্তু শুধু গাছপালা রক্ষা মানেই কি পরিবেশ রক্ষা ? না, তা নয়। এবার সেটাই বলছি।

সূর্য শক্তির ব্যবহার ও আকাশের স্তর

আগেই বলেছি, সালোক সংশ্লেষ বিক্রিয়ার ফলে সবুজ উদ্ভিদ তৈরী করে গ্লুকোজ বা শর্করা। এমনি প্রক্রিয়ায় যখন ১ গ্রাম শর্করা তৈরী হয়, তখন তার মধ্যে জমে থাকে ৪ কিলোক্যালোরি শক্তি।

প্রশ্ন করবে, কিলোক্যালোরি কি ? ১ গ্রাম জলকে ১ ডিগ্রী উত্তপ্ত করতে যতটা শক্তির দরকার হয়, তাকেই বলে ১ কিলোক্যালোরি।

মানুষের চলাফেরা, শোওয়া-বসা, সবসময়েই কমবেশী শক্তির দরকার হয়। হিসাবে দেখা গেছে, প্রতিদিন, মানুষের গড়ে শক্তির দরকার হয় ২৫০০ থেকে ৩০০০ কিলোক্যালোরি। মানুষ খাদ্য থেকেই সংগ্রহ করে এই শক্তি। আর সে শক্তি জোগায় উদ্ভিদ, উদ্ভিদজাত ফল, শাক-সবজি বা তৃণভোজী কিংবা স্বল্প-মাংসাশী প্রাণীরা, যেমন—মাছ, পাঁঠা, ভেড়া, হরিণরা।



১১ নং চিত্র : খাদ্য খাদক সম্পর্কে পরিবেশ বন্ধন

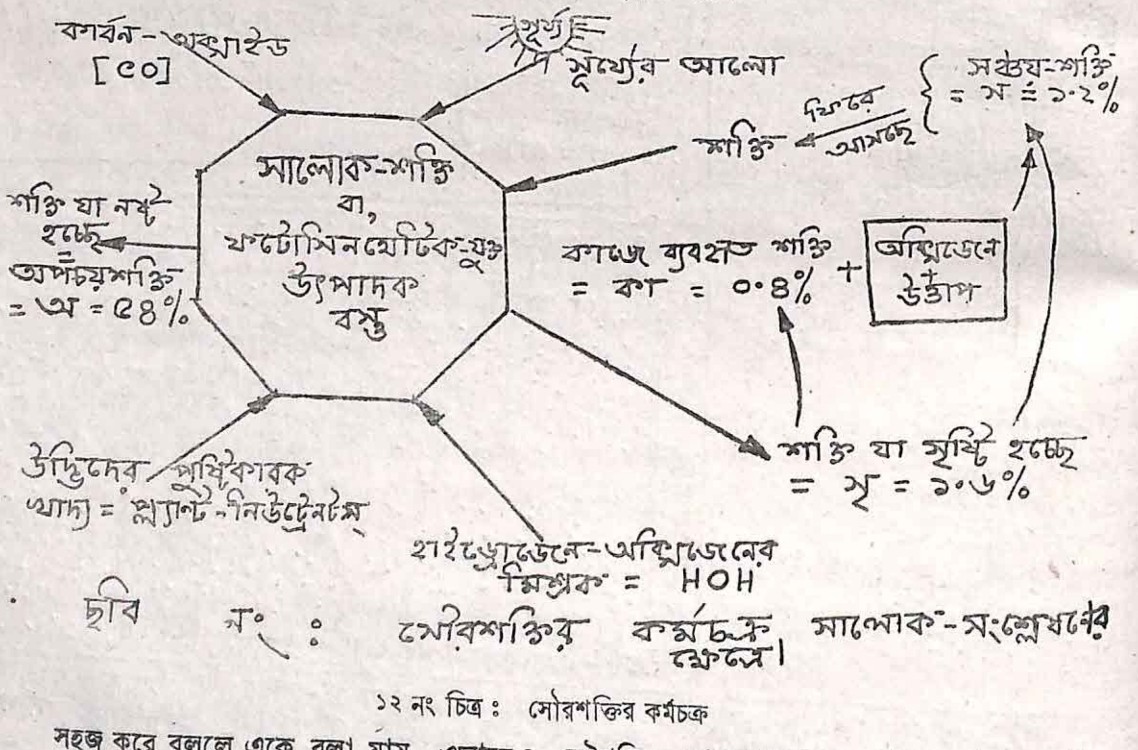
খাদ্য শৃঙ্খল বা খাদ্য-চক্রমতে তৃণভোজীরা উৎপাদক বনজ পদার্থ খেয়ে পালিত হয়। স্বল্প মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজীদের খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার স্বল্প মাংসাশীদের খেয়ে বেঁচে থাকে মুখ্য মাংসাশীরা। কিন্তু একমাত্র মানুষই এই খাদ্য-শৃঙ্খল মানে না। আমরা যেমন শাক-সবজি খাই, তেমনি তৃণভোজী ছাগল, ভেড়া, খরগোসদেরও খাই, আবার স্বল্প-মাংসাশী বন-শুয়োর ইত্যাদি মেরেও খাই। তাই মানুষই খাদ্য-শৃঙ্খলে সবচেয়ে বেশী বিপর্যয় আনছে। মানুষ এমনভাবে সর্বভুক না হোলে খাদ্য শৃঙ্খলে এমন বেসামাল অবস্থা হোত না। খাদ্য থেকে যে শক্তি আমরা পাই, শক্তির পরিমাপ হিসাবে তাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। খাদ্যস্তর ১, ২ ও ৩।

সৌরশক্তি সালোক-সংশ্লেষের কাজে লাগে বলে জানা দরকার সালোক-সংশ্লেষের ক্ষেত্রে সৌর-শক্তির কর্মচক্র কি? ১১ নং ছবিটা এজন্য দেখ।

তোমরা আগেই জেনেছ, সালোকশক্তি কার্যকরী করার জন্য চাই সূর্যের আলো, কার্বন-মনোক্সাইড, মাটি থেকে নেওয়া জলীয় কণা, সবুজ উদ্ভিদের অংশ। এদের সংযোগে সৃষ্টি হচ্ছে নবতম শক্তি।

এই প্রসংগে তোমরা জেনে রাখ, শক্তির ক্ষয় নেই, ক্ষয়ও হয় না। শুধু একরূপ থেকে অন্যরূপে বদল হয়ে যায় শক্তি।

এই প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই দেখা যায়, যে শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে, তার কিছুটা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আর অবশিষ্ট শক্তি সঞ্চিত থাকছে আবার কাজে ব্যবহৃত হবার জন্য।

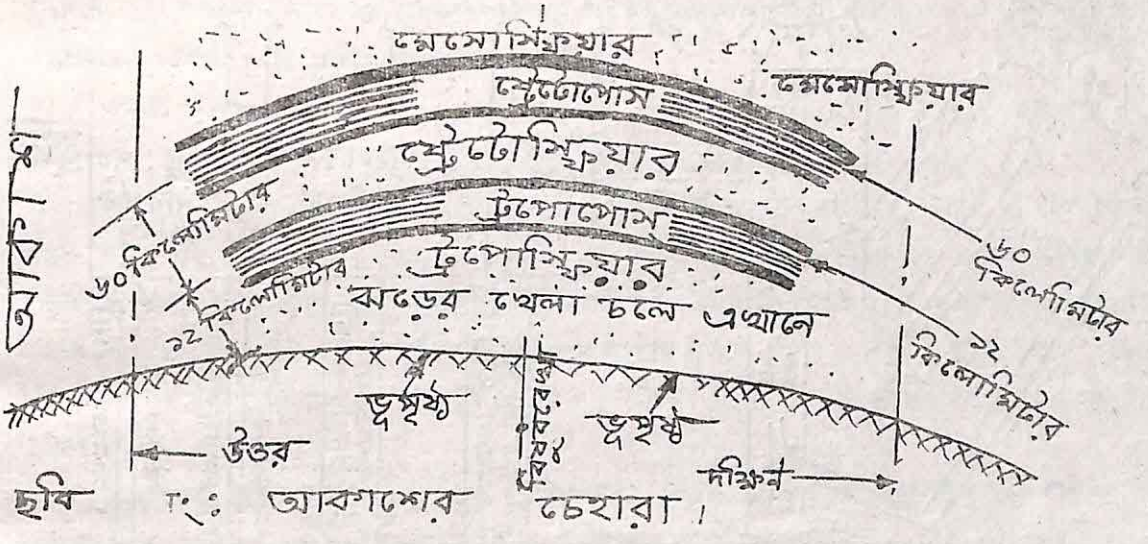


১২ নং চিত্র : সৌরশক্তির কর্মচক্র

সহজ করে বললে একে বলা যায়, এভাবে : সৃষ্টশক্তি = কাজে ব্যবহৃত শক্তি + সঞ্চিত শক্তি; ১২নং ছবিতে সেটাই বোঝান হোল।

তাহলে বুঝতেই পারছ গাছ-গাছালি বাঁচানোর সংগে সংগে সৌরশক্তিকে সঠিক কাজে লাগাতে হবে। এর জন্য চাই বাতাসকে নির্মল রাখা। দূষণ মুক্ত রাখা। নিম্নাকাশে যাতে বেশী ধুলো-গ্যাস ইত্যাদি না জমে, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খুব বেশী বেড়ে না যায় তার দিকে খেয়াল রাখা দরকার।

সেজন্যই দেখ এবার আকাশ বলতে আমরা কি বুঝি ? আকাশের চেহারাটা কি ? আকাশ মানেই কি সীমাহীন অনন্ত নীলাকাশ ? না তা নয়। তবে কি রকম দেখ ১৩ নং ছবিতে।



১৩ নং চিত্র : আকাশের চেহারা

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১২ কিলোমিটার ওপরের আকাশকে বলে ট্রপোস্ফিয়ার বা নিম্নাকাশ। ঝড়ের খেলা চলে আকাশের এই স্তরে।

ট্রপোস্ফিয়ার বা নিম্নাকাশের ঠিক ওপরেই আকাশে এক বিরতিস্তর আছে, তাকে বলে ট্রপোপোস বা প্রাথমিক বিরতিস্তর।

ট্রপোপোসের উপরেই আছে স্ট্রেটোস্ফিয়ার বা মধ্যাকাশ। ট্রপোপোসের উপর থেকে ৬০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত এর বিস্তার।

স্ট্রেটোস্ফিয়ারের ঠিক ওপরের বিরতিস্তরকে বলে স্ট্রেটোপোস বা মাধ্যমিক বিরতিস্তর।

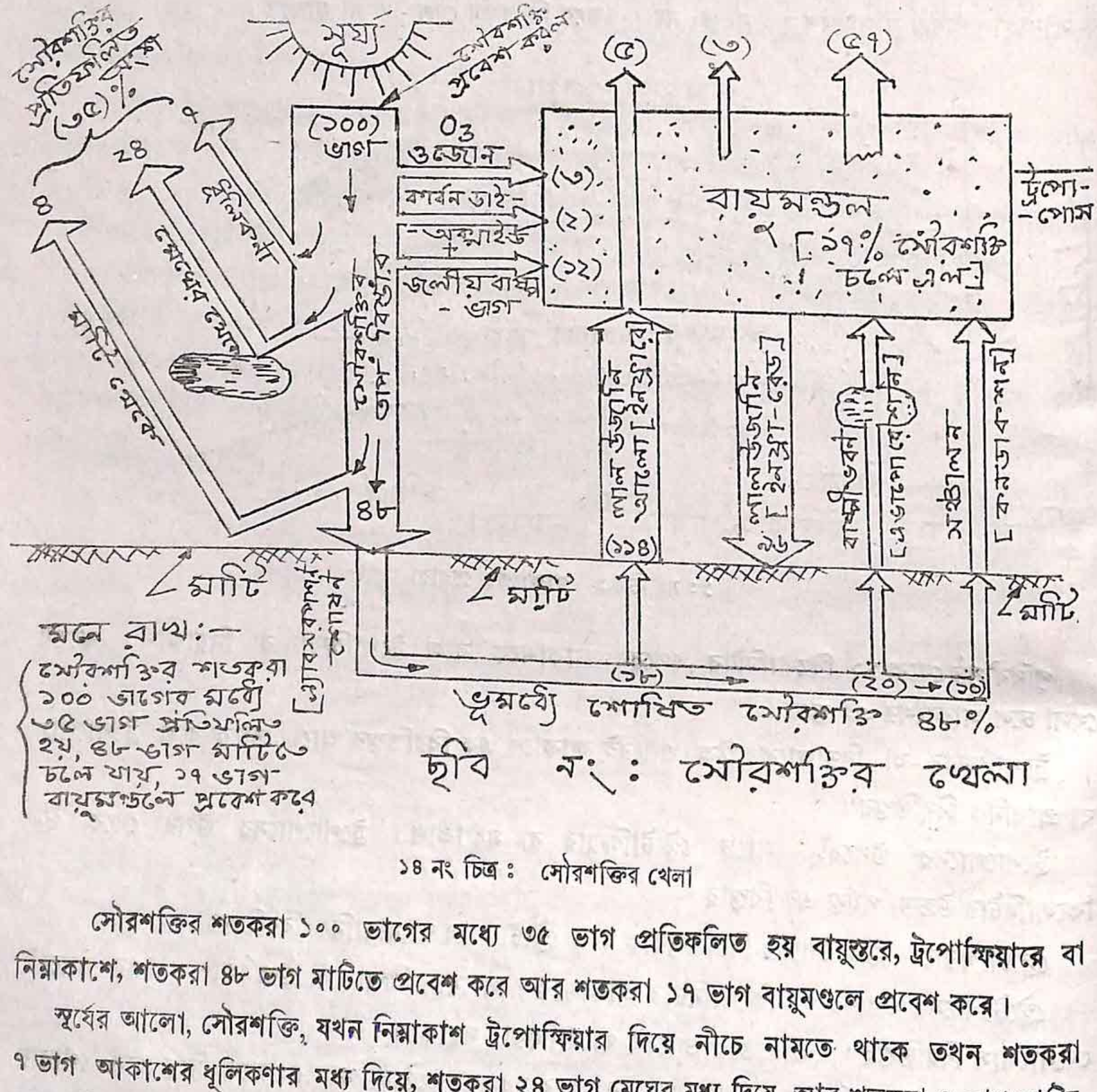
স্ট্রেটোপাসের ওপরের ৩০ কিলোমিটার আকাশকে বলে মেসোস্ফিয়ার বা উর্ধ্বাকাশ। এর ওপরেই মেসোপোস বিরতিস্তর। আর তার ওপরেই থার্মোস্ফিয়ার মহাকাশ।

সূর্যের আলো উর্ধ্বাকাশ মেসোস্ফিয়ার ভেদ করে মধ্যাকাশ স্ট্রেটোস্ফিয়ারের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছায় নিম্নাকাশ ট্রপোস্ফিয়ারে। আর সবশেষে এই নিম্নাকাশ ট্রপোস্ফিয়ার ভেদ করে পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়।

প্রতিদিনে চলতিভাবে আকাশের যে স্তর ধোঁয়াটে হচ্ছে, ধূলি-ধূসরিত হচ্ছে, নানান গ্যাস ও

বিষাক্ত ধোঁয়ায় দূষিত হচ্ছে, ঝড়-ঝঞ্ঝায় এলোমেলো হচ্ছে, সে সবই নিম্নাকাশ ট্রপোস্ফিয়ারেই, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২ কিলোমিটার আকাশস্তরেই এসব হচ্ছে। এর ওপরের আকাশস্তর নিয়ে তাই খুব দুশ্চিন্তা নেই আমাদের।

সূর্যরশ্মি নিম্নাকাশ ট্রপোপোসে পরে কেমন করে ছড়িয়ে পড়ছে দেখ একবার ১৪ নং ছবিতে।



১৪ নং চিত্র : সৌরশক্তির খেলা

সৌরশক্তির শতকরা ১০০ ভাগের মধ্যে ৩৫ ভাগ প্রতিফলিত হয় বায়ুস্তরে, ট্রপোস্ফিয়ারে বা নিম্নাকাশে, শতকরা ৪৮ ভাগ মাটিতে প্রবেশ করে আর শতকরা ১৭ ভাগ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

সূর্যের আলো, সৌরশক্তি, যখন নিম্নাকাশ ট্রপোস্ফিয়ার দিয়ে নীচে নামতে থাকে তখন শতকরা ৭ ভাগ আকাশের ধূলিকণার মধ্য দিয়ে, শতকরা ২৪ ভাগ মেঘের মধ্য দিয়ে, আর শতকরা ৪ ভাগ মাটির সংস্পর্শে এসেই বাতাসের মধ্যে ফিরে যায়। এভাবেই শতকরা ৩৫ ভাগ সৌরশক্তি বাতাসে প্রতিফলিত হয়ে যায়।

এরই সংগে সৌরশক্তির যে ৪৮ শতাংশ মাটিতে প্রবেশ করল, তার ১৮ শতাংশ লাল উজানি আলো বা ইনফ্রারেড শক্তিতে, ২০ শতাংশ বাষ্পীভবনে বা এ্যাভাপোরেশনের ফলে আর ১০ শতাংশ সঞ্চালনক শক্তি বা কনডাকশনের ফলে ফিরে যায় বায়ুমণ্ডলে। এভাবেই সৌরশক্তির শতকরা ৪৮ ভাগ কোনও না কোনও ভাবে ফিরে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলে।

দেখলে তাহলে, ৩৫ আর ৪৮, মোট ৮৩ শতাংশ সৌরশক্তি নানানভাবে ঘুরে এল বায়ুস্তরেই। অবশিষ্ট ১৭ শতাংশ সৌরশক্তি বায়ুস্তরে আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ে ; ওজোন ৩ শতাংশ, কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ২ শতাংশ, আর জলীয় ভাগে ১২ শতাংশ।

বুঝলে তাহলে, সৌরশক্তির কোনও বিনাশ হচ্ছে না। শুধু নানানভাবে নানান জায়গায় সেই শক্তি বিস্তৃত হচ্ছে। পরে আবার সেই শক্তি ঘুরে ফিরেই আসছে বায়ুস্তরে।

এই সংগে একটা মজার কথা জেনে রাখ। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে উঠবে, উত্তাপ বা টেম্পারেচার ততই বাড়বে কমবে, একইভাবে বেড়ে যাবে না বা কমে যাবে না। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুস্তরে, অর্থাৎ নিম্নাকাশ ট্রপোস্ফিয়ারে উত্তাপ কমবে। তারপর মধ্যাকাশ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বায়ুস্তরে উত্তাপ বেড়ে যাবে। তারপর মেসোস্ফিয়ার বায়ুস্তরে আবার উত্তাপ কমবে। এই উত্তাপ কমতে কমতে মেসোপোস বায়ুস্তরে উত্তাপ সবচেয়ে কমে যাবে। কিন্তু মেসোপাস বায়ুস্তরের উপরে থার্মোস্ফিয়ারে উত্তাপ আবার বেড়ে যাবে।

নিম্নাকাশ ট্রপোস্ফিয়ার, মধ্যাকাশ স্ট্রেটোস্ফিয়ার, আর উর্ধ্বাকাশ মেসোস্ফিয়ারের উপাদানিক চেহারা কিন্তু একই রকমের। কিন্তু মহাকাশ থার্মোস্ফিয়ার বায়ুস্তরের বাতাসের চাপ খুব কম, ঘনত্বও খুব কম।

তাহলে কি বুঝলে ? ভূপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে গেলে প্রথমে উত্তাপ কমবে, তারপর বাড়বে, আবার কমবে, শেষে আবার বাড়বে। উত্তাপ প্রথমে কমল নিম্নাকাশ ট্রপোস্ফিয়ারে, তারপর বাড়ল মধ্যাকাশ স্ট্রেটোস্ফিয়ারে, আবার কমল উর্ধ্বাকাশ মেসোস্ফিয়ারে, শেষে বাড়তে লাগল মহাকাশ থার্মোস্ফিয়ারে।

আকাশের এই চেহারাটা জেনে রাখলে পরে বুঝবে বাতাস দূষণ কি করে হয় ? কিন্তু তারও আগে জেনে নাও পৃথিবীপৃষ্ঠের ছবিটা কেমন।

ভূপৃষ্ঠের চেহারাটা কেমন ?

পরিবেশের ব্যাপার-স্যাপার জানতেই যদি চাও তবে তোমাদের একান্তই জানা দরকার, পৃথিবীপৃষ্ঠের চেহারাটা কেমন।

ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তন ৩১.৫ বর্গ কিলোমিটার। এই ভূপৃষ্ঠের কতটা জুড়ে কি রয়েছে এবার সেটাই দেখ।

ভূপৃষ্ঠ [১০০ শতাংশ]

- জলভূমি (সমুদ্র—নদনদী) [৭১ শতাংশ]
- স্থলভূমি [২৯ শতাংশ]
  - বনভূমি ও তৃণভূমি [১০ শতাংশ]
  - কৃষিভূমি [৫ থেকে ৭ শতাংশ]
  - মরুভূমি [৫ শতাংশ]
  - মানুষ অধিকৃত অঞ্চল [৫ থেকে ৩ শতাংশ]
    - ঘরবাড়ী
    - রাস্তাঘাট
    - পাহাড়-পর্বত
    - কল-কারখানা

দেখছ তাহলে, মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ কৃষি জমির ওপর নির্ভর করেই আমরা আমাদের খাদ্যশস্য জোগাড় করছি। জনসংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে বেশী ফসল পাবার আশায় বেশী মাত্রায় সার দেওয়া শুরু হোল মাটিতে। কিন্তু তার ফলে কিভাবে দূষণ শুরু হোল, সেটাই দেখ এবার।

কিন্তু তারও আগে বুঝে নাও মাটির উর্বরতা কার ওপর নির্ভর করে। মাটির উর্বরতা নির্ভর করে মাটির গঠন, প্রকৃতি, কি ধরনের সার ব্যবহার হচ্ছে, এ সবেরই ওপর। তাছাড়া ভূমিসংরক্ষণের ওপরও কৃষিজমির আয়তনের ক্ষতিবৃদ্ধি নির্ভর করে।

গাছের মূল যখন মাটির মধ্যে প্রবেশ কার তখন গাছের মূলদেশ কিভাবে মাটির বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ে দেখান হোল ১৫ নং ছবিতে, ৩১ পৃষ্ঠায়।

প্রথমে জান মাটি কাকে বলে ? মাটি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের শিলাচূর্ণ, নানা অজৈব লবণ, জল, জৈব পদার্থ, নানান্ রকম গ্যাস, যেমন—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নানান্ সূক্ষ্ম উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত পদার্থের মিশ্রণ।

এই মাটির মধ্যে যে মাটিতে ভাল ফসল জন্মায়, তাকে বলে উর্বর মাটি, আর যাতে ফসল কম হয়, বা হয়ই না, তাকে বলে অনুর্বর মাটি।

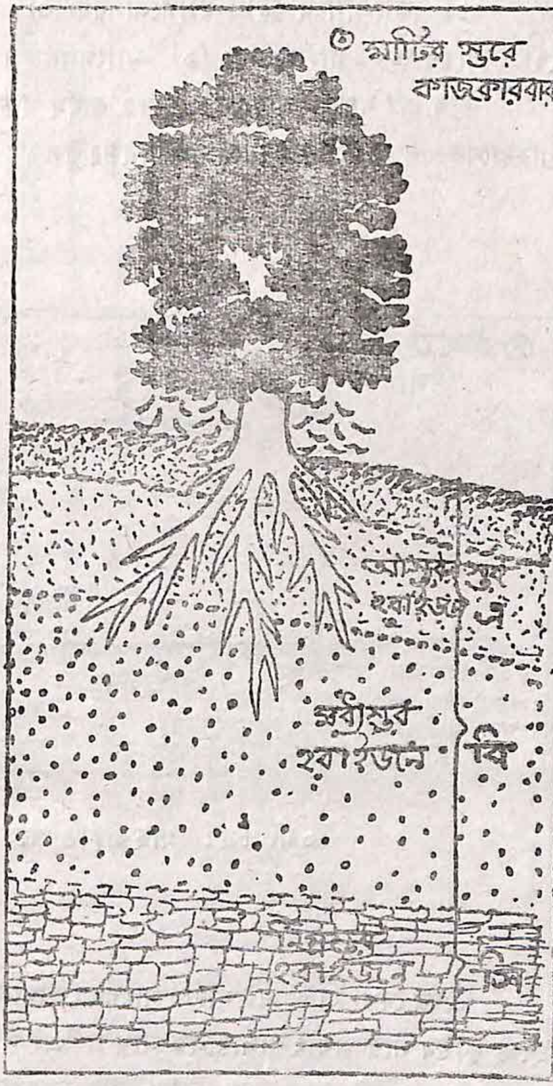
এখন লক্ষ্য কর, মাটির উর্বরশক্তি, গুণাবলী কাদের ওপর নির্ভর করে। মূলতঃ তারা হচ্ছে—

(১) মাটির খনিজ লবণ ও জৈব পদার্থের পরিমাণের ওপর।

(২) মৃত্তিকা কণার আকারের ওপর।

(৩) হাইড্রোজেন আয়ন, ঘনত্ব, জল, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ওপর।

(৪) মাটির তাপমাত্রার উপর।



১৫ নং চিত্র : মাটির নীচে গাছের মূল ছড়াচ্ছে কি ভাবে

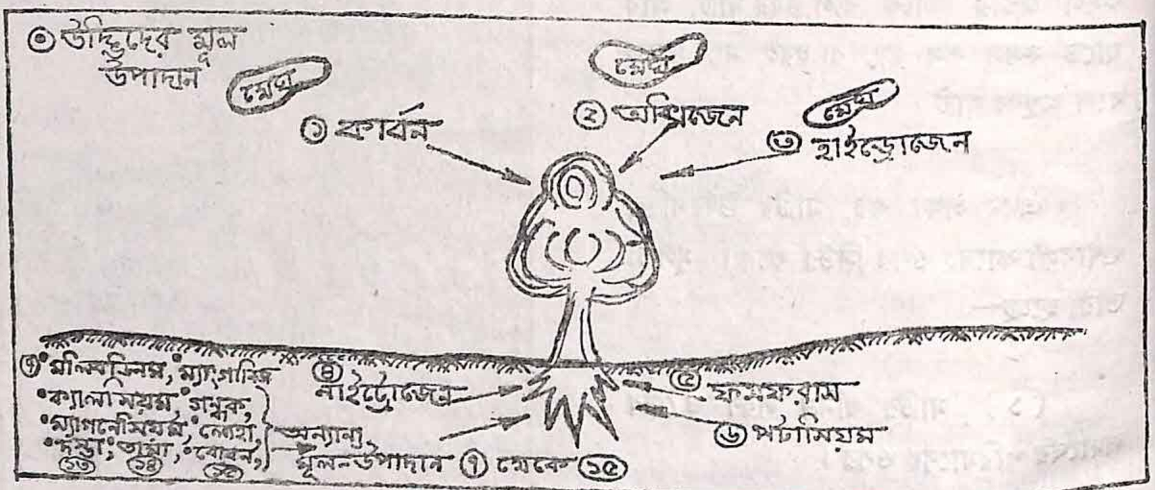
অবশ্য, এছাড়া অন্যান্য বিষয়ও তাছে। তবে তা মূল বিষয় বলে ধরা হয় না।

এরই সংগে সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে বহু মৌলিক পদার্থ থাকলেও ১৫টি মৌলিক পদার্থ-ই প্রাণধারণের জন্য খুবই দরকারী। এসব উদ্ভিদ বাতাস আর মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে।

এ ছাড়াও আরও যে নয়টি উপাদান মাটির উর্বরতা বাড়ায় বা কমায়, তারা হচ্ছে—

(১) ক্যালসিয়ম (২) ম্যাগনেসিয়ম (৩) গন্ধক (৪) লোহা (৫) দস্তা (৬) স্বল্পমাত্রায় তামা (৭) বোরণ (৮) মলিবডিনম (৯) ম্যাংগানিজ।

তবে এই নয়টি উপাদানের চেয়েও প্রথম তিনটি উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়মের পরিমাণের ওপরই মাটির উর্বরতা বেশী নির্ভরশীল। ১৬নং ছবিটা এ ব্যাপারে দেখে নাও।



১৬ নং চিত্র : গাছ প্রকৃতি থেকে তার উপাদান কেমন করে সংগ্রহ করে

এখন দেখা যাক, এই মাটির সারের জোগানদার কারা? আজকের দিনে মাটিতে ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্তিম সার অর্থাৎ রাসায়নিক সার। এই সার ব্যবহার শুরু হয়েছে এই শতাব্দী থেকেই। তাহলে গত ছশো কোটি বছর ধরে কারা সার সরবরাহ করে প্রকৃতির অরণ্য সম্পদ বনরাজিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল? আর তা কেমন করে সেটা একটু জেনে নাও।

মাটির সার যোগান দিচ্ছে যারা

↓

(১)

স্বল্প ভূমিক্ষয় [যা স্বাভাবিক ভাবে হয়]

↓

উপরের হাল্‌কা মাটির স্তর সরে গিয়ে খনিজ লবণযুক্ত মাটি ওপরে উঠে আসে। এরই ফলে মাটি থেকে উদ্ভিদ যতটা মৌলিক পদার্থ টেনে নিয়েছে তা পূরণ হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ।

(২)

অরণ্যের গাছপালা, উদ্ভিদ, প্রাণীরাই নানানভাবে ফিরে আসে মূল উপাদানে।

↓

অরণ্যে যে সব গাছপালা লতাপাতা জন্মায়, তারাই সেই মাটিতে ঝরে পড়ে। বনজ পশু-পাখী যে সব ফলমূল খায় তাদের বিষ্ঠা বা মৃত্যুর পরে তাদের দেহাবশেষ, হাড়গোড় অরণ্যেই পড়ে থাকে।

এ ছাড়া মাটির মধ্যের ছত্রাক, শৈবাল, অজস্র ব্যাকটেরিয়া নিজদেহের এ্যানজাইমের সাহায্যে ঐসব জৈব পদার্থকে রূপান্তরিত করে মূল উপাদানে নিয়ে আসে।

(৩)

মাটির মধ্যের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া সোজাসুজি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে মাটিতে তাকে পরিবাহিত করে।

↓

বিশিষ্ট যে দুই ধরনের ব্যাকট্রিয়া এই নাইট্রোজেন আহরণের কাজ করে তাদের নাম অ্যাজটা ব্যাকটার ও ক্লসডিয়ম ব্যাকট্রিয়া। নীল হরিৎ শেওলার দলও এই কাজ করে।

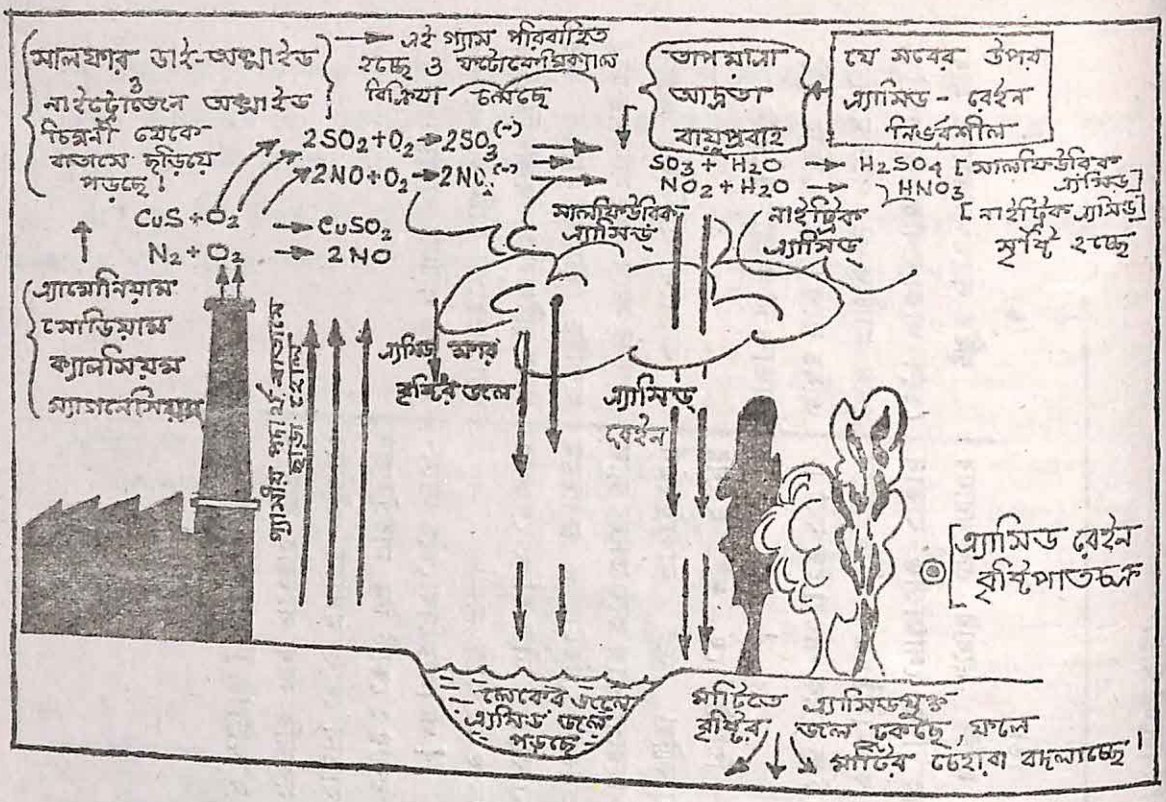
[পরীক্ষায় দেখা গেছে আমেরিকায় ১ কোটি টন নাইট্রোজেন বাতাস থেকে মাটিতে এইভাবে সরাসরি সার সরবরাহ করে ঐ ব্যাকট্রিয়ারা]

(৪)

বৃষ্টির সংগে বাতাসের মধ্যে ভেসে থাকা রূপান্তরিত নাইট্রোজেন মাটিতে এসে পড়ে নাইট্রিক এসিড রূপে। এই জাতীয় বৃষ্টিপাতকে বলে এ্যাসিড রেইন।

↓

বাতাসে মিশ্রিত অন্যান্য গ্যাসের সংগে কিছু সালফার-ডাই অক্সাইড গ্যাসও থাকে। এই গ্যাস বৃষ্টিধারার সঙ্গে সালফিউরিক এ্যাসিডরূপে মাটিতে পড়ে ও গন্ধকের পরিমাণ বাড়ায়।



১৭ নং চিত্র : এ্যাসিড রেইন

এ্যাসিড রেইন ব্যাপারটা বুঝতে হলে ১৭ নং ছবিটা দেখ। এই সংগে এটাও জানা দরকার বৃষ্টির জলে মিশ্রিত নাইট্রোজন সঠিক হারে মাটিতে ফিরে এলে একটি মূল উপাদান মাটি আপনা থেকেই ফিরে পায়। কিন্তু এই মাত্রা বেশী বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ বেশী মাত্রায় এ্যাসিড যুক্ত বৃষ্টির জল মাটিতে পড়লে মাটিরও যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি উদ্ভিদ, জলজ প্রাণী সবকিছুরই বিশেষ ক্ষতি হয়।

মাটি তার সার কিভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে সংগ্রহ করে সেটাতো জানলে। কিন্তু মাটির স্তরে কিভাবে কাজ কারবার চলে সেটাও তো জানা দরকার। সেটাই বলছি এবার। ১৬ নং ছবিটা দেখ।

মাটির স্তরকে তিন স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

(১) মাটির উপরস্তর বা আস্তরণ স্তর—একে হরাইজন A নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই স্তরে থাকে সজীব ঘাসের আস্তরণ, কিছু শস্য-ঝরা গাছের পাতা। এই ঝরা পাতার ঠিক নীচেই পাওয়া যায় বিগত বছরের কালচে রঙের পুরানো ঝরা পাতা। তখন এই বিগত বছরের পাতাগুলো রূপান্তরিত হচ্ছে মাটিতে। এই রূপান্তরিত পাতার নীচেই আছে নরম মাটি, আর এই মাটিতেই উদ্ভিদের শিকড় ছড়িয়ে যায়। এই নরম মাটির রঙ হয় কাল, লাল বা ধূসর রঙের। এই মাটির দানাগুলো খুব সূক্ষ্ম ধরনের।

এতে জৈব পদার্থের পরিমাণও থাকে অনেক। মাটি সার সংগ্রহ করে এই মাটির উপরস্তর বা আস্তরণ স্তর থেকেই।

(২) মাটির মধ্যস্তর বা মাটির শিলাস্তর ঃ—বিজ্ঞানীরা একে নাম দিয়েছেন হরাইজন B, এই স্তরে আদি শিলাস্তরের রূপান্তরণ চলে। উদ্ভিদ শিকড়ের মধ্য দিয়ে সামান্য কিছু সার এই স্তর থেকেও সংগ্রহ করে।

(৩) মাটির নিম্নস্তর বা আদি শিলাস্তর ঃ—বিজ্ঞানীদের ভাষায় এই স্তরকে বলা হয় হরাইজন C ; আদি শিলাস্তর ক্রমে ভেঙে-চুরে সূক্ষ্ম হয়ে মাটির এই স্তর সৃষ্টি করে।

মজার কথা কি জান, বায়ুপ্রবাহ, নদীস্রোত এই মাটির ওপরের স্তরকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। তখন এই প্রবাহিত স্তর পলির আকারে ধীরে ধীরে জমা হয়ে চরের সৃষ্টি করে। এভাবেই নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ, চরের সৃষ্টি হয়। এভাবেই যখন ওপরের স্তর বা আস্তরণস্তর বা হরাইজন A সরে যায়, তখন এই প্রাকৃতিক কার্যধারাকে বলে ভূমিক্ষয়।

ভূমিক্ষয়ে এভাবে ওপরের স্তর সরে গেলেই কি বিপদ হবে ? হ্যাঁ, যদি দ্রুত ওপরের স্তর এভাবে সরে যায় বা ভেঙে পড়ে, তবে আদি শিলাস্তর বা হরাইজন C উন্মুক্ত হয়ে পড়বে। ফলে মাটির ফসল ধারণের, জীবজগতের চারণভূমি হারিয়ে যাবে।

কিন্তু একটা কথা এই প্রসংগে জানা দরকার, ভূমিক্ষয়কে একদম বন্ধ করা ঠিক নয়। প্রতি হাজার বছরে অন্তত দু-তিন সেন্টিমিটার ভূমিক্ষয় বা ওপরের স্তর ঐ অনুপাতে সরে গেলে, তলার শিলাস্তর থেকে খনিজ লবণযুক্ত মাটি ক্রমে ওপরে উঠে আসে। ফলে, ওপরের স্তরে বা আস্তরণস্তরে যেটুকু খনিজ লবণের ঘাটতি হয়েছিল তা আপনা-আপনি পূরণ হয়ে যাবে।

তাই পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে দেখতে হবে ভূমিক্ষয় যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়।

এরই সংগে দেখতে হবে এ্যাসিড রেইন যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়। বৃষ্টির জলের অম্লত্ব কত তার ওপরে বোঝা যায় ঐ বৃষ্টির জলে মাত্রাতিরিক্ত এ্যাসিড আছে কিনা। এই মান ৫.৭ P থেকে ৭.০০ P^H হলে বুঝতে হবে জলে এ্যাসিড পরিমাণ বিপদজনক নয়।

হয়ত এখন বলবে P^H কথাটা কি ? P^H সংখ্যার মান দিয়ে বোঝান হয় জলে অম্লত্ব আছে না, ক্ষারত্ব আছে। যখন P^H এর মান ৭, তখন বুঝবে জলে অম্লত্বও নেই, ক্ষারত্বও নেই। আবার P^H যখন ৭-এর নীচে হবে, তখন বুঝবে জলে অম্লত্ব আছে, আর যখন ৭-এর উপরে করে তখন বুঝবে ক্ষারত্ব আছে। আগেই বলেছি, এ্যাসিড রেইনের সৃষ্টি হয় কলকারখানা থেকে নির্গত গ্যাস যখন বাতাসের উপাদানের সংগে মিশে নাইট্রিক এ্যাসিড, সালফিউরিক এ্যাসিডের সৃষ্টি করে ও বৃষ্টির সংগে মাটিতে নেমে

আসে। ভারতবর্ষের শিল্পসমৃদ্ধ শহর বাঙ্গালোর, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, পুনে ইত্যাদিতে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে সেসব জায়গার বৃষ্টির জলের অম্লত্ব এখনও বিপদ সীমা লঙ্ঘন করে নি। তবে মান দেখে মনে হচ্ছে অচিরেই তা করতেও পারে। তাই শিল্প থেকে এই বিপদ যাতে না সৃষ্টি হয়, পরিবেশ যাতে এ্যাসিড রেইনে বিপর্যস্ত না হয় খেয়াল রাখার সময় এসেছে।

এ ব্যাপারে একটা মজার গল্প এবার শুনে নাও। পশ্চিম জার্মানীতে রূঢ় শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠায় ও কল-কারখানা দ্রুত বিস্তার লাভ করায় রূঢ় অঞ্চলের কিছু দূরেই সুইডেনের ২০ শতাংশ অঞ্চল এ্যাসিড রেইনের কবলে পড়ল। সুইডেনে স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ঘনঘন চোখের রোগ শুরু হল, চোখ খারাপ হোতে লাগল। ফলে সুইডেনের ছেলে-মেয়েরাই ফেষ্টুন হাতে শ্লোগান তুলল—এ্যাসিড রেইন বন্ধ কর। আমাদের শরীর স্বাস্থ্যকে বাঁচাও। বাচ্চাদের এই শ্লোগানে সজাগ হোল পশ্চিম জার্মানীর শিল্পাঞ্চল। কলকারখানার উৎক্ষিপ্ত গ্যাস যাতে এ্যাসিড রেইন আর সৃষ্টি না করে সেদিকে নজর দিল। ঠিক এমনই ঘটনা ঘটল স্ক্যাণ্ডিনোভিয়ায়। ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলের জন্য দূরে স্ক্যাণ্ডিনোভিয়নরা পড়ল এ্যাসিড রেইনের কবলে। ঝগড়াঝাটি শুরু হোল দুই দেশে।

অর্থাৎ রামের দোষে এমনি করেই পরিবেশ দূষিত হয়ে শ্যামের দল ভোগ করল। বেহিসাবী দূষণকারী শিল্পাঞ্চল তৈরী হোলে হয়ত কাল বা পরশু আমরা তোমরাও এমনি দুর্ভাগ্যে পড়তে পারি। তাই শিল্প গড়ে উঠলেই সজাগ হওয়া দরকার।

দ্রুত প্রগতির জন্য দ্রুত কলকারখানা তৈরী করে শহর সমৃদ্ধ হলেও ঠিক তারই চারপাশ জুড়ে যে গ্রামাঞ্চল থাকল, ফসল ভূমি থাকল, তা যে এ্যাসিড রেইনের কবলে পড়বে না তার নিশ্চয়তা নেই। শিল্পজাত উৎক্ষিপ্ত গ্যাস যাতে বাতাস দূষিত বিপদজনক না করে খেয়াল রাখার সময় এসেছে, নয় কি ?

সার থেকে মাটির দূষণ

আগেই বলেছি মাটি থেকে প্রয়োজনীয় সার গ্রহণ করে গাছপালা দ্রুত বেড়ে উঠে। মাটি যাতে তার প্রয়োজনীয় ১৫টি উপাদানের মধ্যে তিনটি উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়ম সঠিকভাবে পায় সেদিকে খেয়াল রাখলে মাটি যথাযথ ফসল গাছপালা সৃষ্টি করতে পারে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, যাবতীয় জৈব পদার্থ শতকরা ২০ থেকে ৬০ ভাগ তার জৈব পদার্থকে মাটিতেই ফিরিয়ে দেয়। বাকী জৈব পদার্থের ঘাটতি মেটাতে মাটিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু মনে রাখবে, রাসায়নিক সার বেশী মাত্রায় ব্যবহার করার ফলে শুধু যে সারের অপচয়ই হচ্ছে তা নয়, নদী-নালা-মাটিও দূষিত হয়ে উঠছে। কেমন করে নীচে বোঝান হচ্ছে।

সারণী ২ঃ কতখানি সার অপচয় হয়ে দূষণ হচ্ছে

সারের ধরন	সার কতটা বাড়তি হয়	ফলাফল কি
১। অ্যামোনিয়াজাত সার [অ্যামোনিয়া সালফেট]	৬০ থেকে ৭০ শতাংশ	জলে ধুয়ে জমির নীচের স্তর দিয়ে গিয়ে নদী-নালায় পৌঁছায় ও তাদের দূষিত করে।
২। ফসফরাস সার—	৮০ থেকে ৯০ শতাংশ	এই ফসফরাস অপচয় মারাত্মক। জলজ প্রাণী যেমন মাছ ইত্যাদির দেহে এই ফস-ফরাস জমা হয়। পরে মানুষ সেই মাছ খেলে ফসফরাস মানবের দেহে চলে আসে ও দূষণ সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর মাত্র পাঁচ শতাংশ জমির থেকে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়, তাই দিয়ে প্রায় ৪০০ কোটি মানুষ তার খাদ্যশস্য পাচ্ছে। সেজন্যই সার ব্যবহার একান্তই প্রয়োজন। যথাযথ সার ব্যবহার না করলে খাদ্যভাণ্ডার বাড়বে না, আবার বেশী মাত্রায় ব্যবহার করলে নদী-নালা-সমুদ্র দূষিত হয়ে যাবে।

এরই সংগে মনে রাখা দরকার এই ৫ শতাংশ জমি থেকে যে ফসল পাওয়া যায় তা যেন পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচে। সেজন্যই কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারেও অনেক বিপদ আছে।

দেখা গেছে, কীটনাশক ওষুধ মাটিতে পড়লে ১৪ থেকে ১৭ বছর তার বিষকর ক্রিয়া মাটিতে থেকে যায়। আরও দেখা গেছে, শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ এই কীটনাশক ওষুধ উদ্বৃত্ত হয়ে মাটিতে রয়ে যায় ও পরে মাটির তল দিয়ে জলতলে পৌঁছিয়ে নদী-নালায় জমা হয়। তখন এসব কীটনাশক ওষুধ জলজ গুল্ম, শৈবাল ও লার্ভাদের মধ্যে প্রবেশ করে। পরে, জলজ প্রাণী যেমন মাছ ইত্যাদি এই কীটনাশক ওষুধ যুক্ত জলজ গুল্ম, শৈবাল ও লাভা খেয়ে বড় হয়। এরই ফলে মাছদের ও জলজ প্রাণীদের দেহে অনেকটা, প্রায় ৪০ শতাংশ ডি. ডি. টি. এ্যানড্রিন জাতীয় কীটনাশক ওষুধ ঢুকে পড়ে। এরপর এই ডি.ডি.টি. যুক্ত মাছ যখন আমরা খাই তখন মানুষের শরীরে এই কীটনাশক বিষাক্ত ওষুধ ডি.ডি.টি. বা

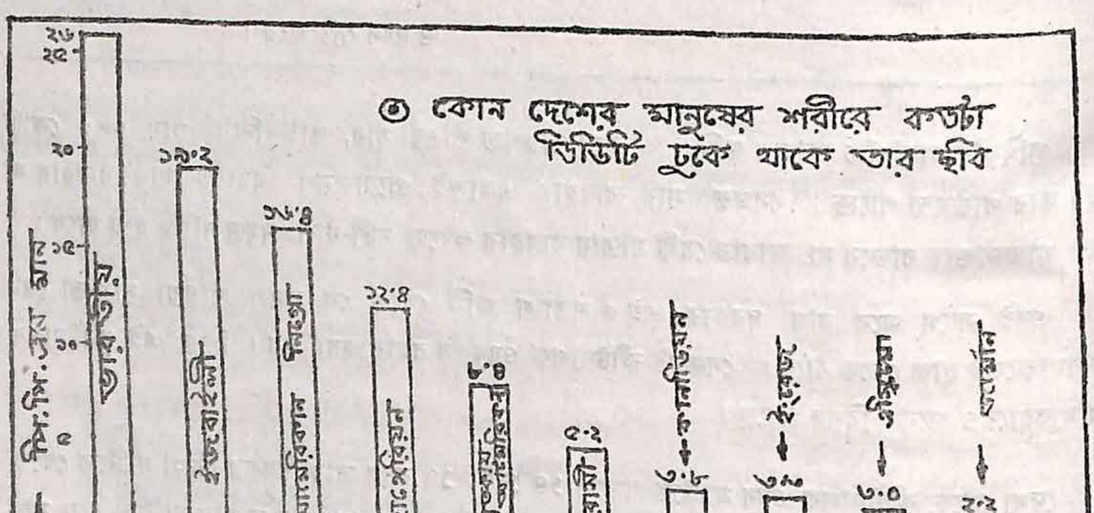
এ্যানড্রিন ইত্যাদি ঢুকে পড়ে ও রয়ে যায়। মানুষ অজান্তেই দূষণযুক্ত বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধের কবলে পড়ে যায়। ৩৯ পৃষ্ঠার ১৯ নং ছবিটা এজন্যেই দেখ।

ডিডিটি, গ্যামাক্সিন, এ্যানড্রিন, অ্যালাড্রিন, ডেলড্রিন, ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর—এসব হচ্ছে সেই কীটনাশক ওষুধ যা ১৪ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত কার্যকারী থাকে মাটিতে ব্যবহারের পরও। আর দেখা গেছে, শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ এই ওষুধ মাটিতে উদ্বৃত্ত থেকে যায়।

এজন্যই শাক-সবজি দুধ মাখনের মধ্যে দিয়েও ডিডিটি বা অন্য কীটনাশক ওষুধ মানুষের শরীরে ঢুকে পড়ে। সেজন্যই আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের শরীরে কমবেশী কিছু ডিডিটি ঢুকে আছেই। পরীক্ষায় দেখা গেছে ভারতীয়দের শরীরে ২৬ পিপি এম ডিডিটি ঢুকে আছে। আর সবচেয়ে কম আছে জার্মানদের শরীরে ২˙২ পি পি এম।

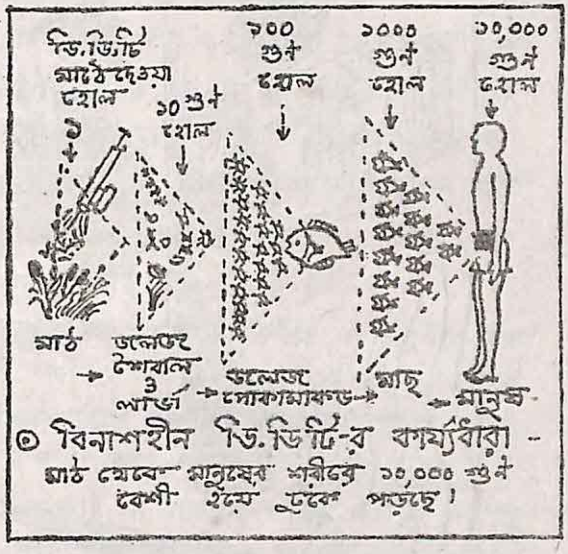
[পিপিএম কথাটার মানে কি জান ? পার্টস পার মিলিয়ন। তরল পদার্থে পরিমাণ বোঝাতে এই মান বিজ্ঞানীরা হামেশাই ব্যবহার করেন। এই কথাটার সোজা মানে, ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ।]

ডিডিটি কোন জাতের মানুষদের শরীরে অজান্তে কতটা ঢুকে আছে তা বোঝাবার জন্যই ১৮নং ছবিটা।



১৮ নং চিত্র : কোন দেশের মানুষের শরীরে ডি. ডি. টি. কতটা ঢুকে আছে

১৯নং ঃ ছবিতে দেখ মানুষের শরীরে কিভাবে ডিডিটি ঢুকে যাচ্ছে।



১৯ নং চিত্র ঃ ডিডিটি কেমন করে ক্ষেত থেকে শরীরে ঢুকছে

তাই এসব দেখে বুঝতে পারছ, শস্য ভাণ্ডার বাড়াবার জন্য সার ব্যবহার করা দরকার, কিন্তু নিয়ন্ত্রিতভাবে। আবার ক্ষেতখামার, গাছপালা বাঁচাবার জন্য কীটনাশক ওষুধও ব্যবহার করতে হবে খুব হিসেব করে, না হলে, আমরাই সেই বিষাক্ত ওষুধের কবলে পড়ব। এজন্যই ডি.ডি.টি.র ব্যবহার আজ পৃথিবীজুড়ে বন্ধ হতে চলেছে।

এসব কথা ভুলে গেলেই গাছপালার ক্ষতি, জমি, জল, জলজগুল্ম, জলজপ্রাণী সবাই বিপন্ন হবে।

পরিবেশ ভারসাম্য **রক্ষার** ক্ষেত্রে বিষাক্ত ছোবল বসাবে এই অতিরিক্ত ব্যবহৃত সার বা কীটনাশক ওষুধেরা।

পরিবেশের দূষণ কোথায় কোথায়

পৃথিবীর জন্ম, পরিবেশ সৃষ্টির কথা, মাটির চেহারা, আকাশের নানান স্তরের ছবি, এসবের কথা জেনে এতক্ষণে এটুকু বুঝতে পেরেছ, পরিবেশ কি, পরিবেশ ভারসাম্য কি ?

এটুকু হয়ত এখন বুঝেছ, যে পরিবেশে আমরা, উদ্ভিদরা, প্রাণিজগত বেঁচে আছি, তাকে দূষণমুক্ত না রাখলে বিপদ আমাদেরই।

তাহলে দেখ, পরিবেশের কোন কোন স্তরকে দূষণমুক্ত রাখা একান্তই দরকার। জল, বায়ু, মাটি, আর শব্দ—এই চার স্তরকে যদি দূষণমুক্ত রাখা যায়, তবেই আমরা সত্যিকারের পরিবেশ দূষণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারব।

নির্মল বাতাসকে দরকার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য। দূষণমুক্ত মাটি চাই যাতে পরিবেশ দুর্গন্ধময় না



২০ নং চিত্র : বাতাস মাটি নদী শব্দ মানুষকে কিভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে

হয়ে উঠে। মাটি দূষণমুক্ত না হলে গাছপালা, শস্য সবারই বিপর্যয় আসতে পারে। নদী-সমুদ্র দূষণহীন হওয়া দরকার, কারণ জলজ-উদ্ভিদ, প্রাণী, মাছ না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া পানীয় জল ইত্যাদির জন্যও এই জলভাণ্ডারকে দূষণহীন অবস্থায় যতটা রাখা যায়, ততই ভাল। আর সবশেষে কলকারখানা ইত্যাদির শব্দ মানুষ, পশুপাখী, এমন কি উদ্ভিদেরও বিপদ সৃষ্টি করে।

তাই এই চার স্তরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই।

পরিবেশ দূষণরোধে বনানীই প্রহরী

বাতাসকে, আবহাওয়াকে পরিষ্কার রাখতে হলে নিম্নাকাশ ট্রপোস্ফিয়ারকে নির্মল রাখা দরকার। কিন্তু বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা, নানান ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ও শিল্পজাত গ্যাস বাতাসকে দূষিত করেই। এছাড়াও নদী-নালা-ভূপৃষ্ঠ থেকেও নানান গ্যাস, দূষিত সূক্ষ্ম পদার্থকণা বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। এসবের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে বাতাসের ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে বিপদের সৃষ্টি হবেই।

বুঝলে তো, বাতাস দূষণরোধের ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু প্রকৃতিদেবী বনাঞ্চল সৃষ্টি করে আপনা থেকেই বাতাস পরিশোধনের যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন, আমরা আজকাল সেকথা ভুলে গিয়ে, বনজংগল কেটে ফেলে, নিজেরাই নিজেদের, পায়ে কুড়ল মারছি।

প্রশ্ন করবে, বনাঞ্চল কেমন করে বাতাস পরিশুদ্ধ করে ? গাছের পাতা ফিল্টার বা ছাকুনীর মত কাজ করে বাতাসের সূক্ষ্মতম ধূলিকণা ও নানান রাসায়নিক পদার্থকে আটকে রেখে, নির্মল বাতাসকে আবহাওয়া মণ্ডলে ছেড়ে দেয়। এছাড়াও নানান কলকারখানায় অত্যধিক দহনের জন্য ও আরও বিভিন্ন কারণে যখন বাতাসের অক্সিজেনে ঘাটতি পড়ে, তখন গাছপালাই সেই ঘাটতিকে পূরণ করে।

এই প্রসংগে একটা মজার কথা জেনে রাখ। ধূলো বা ডাষ্ট, যা বাতাসে ছড়িয়ে থাকে তা শুধু সেই জায়গার আকাশকেই দূষিত করে তা নয়, সেই ধূলোবালি বহু বহুদূর পর্যন্তও ছড়িয়ে যেতে পারে। বাতাসের সংগে, ধূলোবালি হাজার হাজার মাইল ভেসে যেতে পারে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। শুনলে অবাক্ হবে, সুদূর সাহারা মরুভূমির ধূলিময় বাতাস আমাদের এই ভারতবর্ষে এসে পৌছায়, আমাদের আকাশ-বাতাসকে দূষিত করে।

তবে একটা কথা, ভাসমান ধূলি বা ডাষ্টকে পুরোপুরি দূষণক পদার্থ বলা উচিত নয়। মেঘ সৃষ্টির কাজে ভাসমান ধূলিকণার দরকার হয়। কিন্তু তার মাত্রা বেড়ে গেলেই মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কারক হয়ে দাঁড়ায়। এই ধূলিময় বাতাস থেকেই হাঁপানি, ব্রংকাইটিশ জাতীয় ফুসফুসের রোগের সৃষ্টি হয়।

বাতাসের মধ্যে থাকে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয়-বাষ্প, নানান ধরনের শিল্পাঞ্চল থেকে নির্গত গ্যাস, আর ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ।

এছাড়াও বাতাস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিয়ে যায় পুষ্পরেণু, সূক্ষ্ম ছত্রাক জাতীয় পদার্থ, নানান ধরনের ব্যাকট্রিয়া ও ভাইরাশ জাতীয় বিপদজনক বীজাণুকে।

বাতাস সম্পূর্ণ নির্মল কোনকালেই ছিল না। তবে যেটুকু দূষিত ছিল তাকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা ছিল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহযন্ত্রের মধ্যেই। কিন্তু বাতাসে দূষিত পদার্থের পরিমাণ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যদি উদ্ভিদ জগতকে নির্মমভাবে কেটে না ফেলা হোত, তবে হয়ত উদ্ভিদ তার স্বাভাবিক বাতাস পরিশোধন ক্ষমতাকে আরও কাজে লাগাতে পারত।

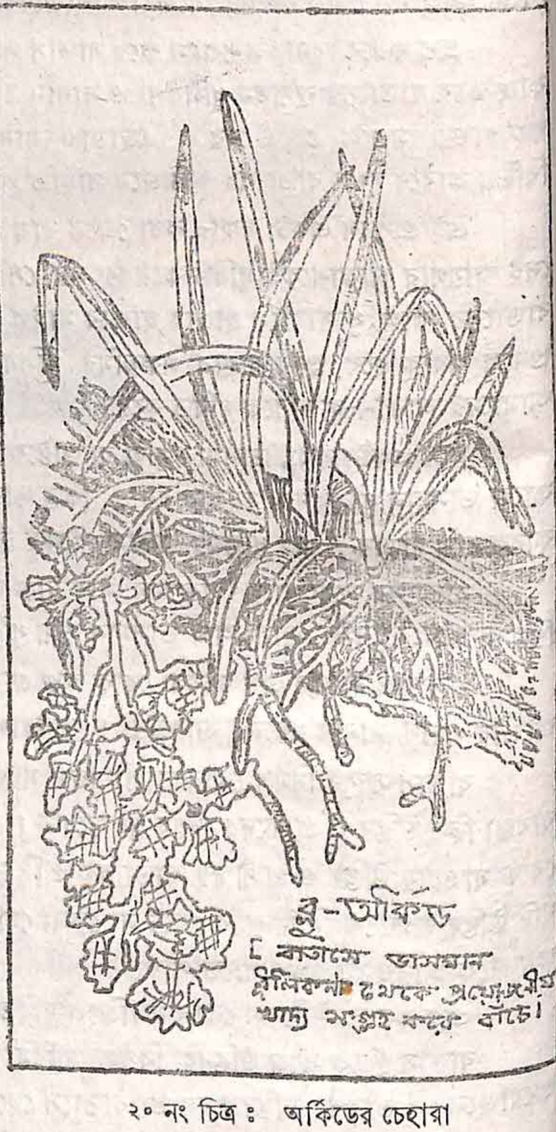
প্রশ্ন করবে, উদ্ভিদরা কোন ম্যাজিকে দূষিত বাতাসকে বিশুদ্ধ করে তোলে ? সেটাই বলছি এবার।

বাতাস থেকে সবুজ উদ্ভিদরা বিপুল পরিমাণে দূষিত গ্যাস ও সূক্ষ্মকণা টেনে নেয় নিজেদেরই প্রয়োজনে। তারপর উদ্ভিদ যখন তা বাতাসে ছেড়ে দেয়, তখন বাতাস পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে।

দীর্ঘজীবী গাছের পাতার রন্ধ্রগুলি পাতার তলায় থাকে। এই অবস্থায়, ভাসমান ধূলিকণাযুক্ত বাতাস যখন বনাঞ্চল বা দীর্ঘপত্রযুক্ত গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে বয়ে যায়, তখন গাছের ওপর ও নীচের পত্রসারিতে সেই ধূলিকণাযুক্ত বাতাস ধাক্কা খায়। বৃহত্তর ধূলিকণাগুলো গাছের লতাপাতা, ডালপালায় ধাক্কা খেয়ে গাছের গুঁড়ির গায়ে ঝরে পড়ে। অবশিষ্ট ধূলিকণাযুক্ত বাতাসের কিছুটা পাতার ওপর পড়ে, শোধিত হয়, তারপর শোধিত বাতাস হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়। আর বাদ বাকী ধূলিকণাযুক্ত বাতাস প্রবাহিত হয়ে যায় বাতাসের সংগে বাতাসের গতির দিকে।

বায়ুর গতি, ভাসমান ধূলিকণার মাপ ও রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণের ওপরই নির্ভর করে কতটা ধূলিকণা গাছের পাতায় আটকে থাকবে আর কতটা গাছের গুঁড়ির কাছে ঝরে পড়বে।

গাছের পাতা যেমন ধূলিকণাযুক্ত দূষিত বাতাসকে অনেকটা নির্মল করে, তেমনি অর্কিডরাও এই ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। অর্কিড কাদের বলে জানতো? অর্কিড হচ্ছে এক ধরনের পরজীবী গাছ, যারা গাছের ডালে জন্মায়। মাটির সঙ্গে বেশীর ভাগ অর্কিডেরই সম্পর্ক নেই। এই অর্কিডরা ভেলামেন নামক বিশিষ্ট অংশের সাহায্যে বাতাসে যে সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাসমান ধূলিকণা ও জলকণা থাকে তাদের সংগ্রহ করে। তারপর তাদের থেকে প্রয়োজনীয় সার পদার্থ শুষে নেয় ও বাঁচে। এই অর্কিডরা নানান রঙের ফুলও দেয়। উদ্ভিদ জগতে সবচেয়ে পরে এসেছে এই অর্কিডরা। বাতাস শুধু যদি নির্মল হোত, শুধু যদি অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর জলীয় কণায় ভরা থাকত তবে এই অর্কিড গোষ্ঠীই পৃথিবীতে থাকত না। আজ যে প্রায় বিশ হাজার অর্কিড আমরা দেখতে পাই, বাতাসে ধূলিকণা না থাকলে এরাও থাকত না।



২০ নং চিত্র ঃ অর্কিডের চেহারা

অর্থাৎ দেখছ তোমরা, পরিবেশে যখনই কোথাও দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানেই তার প্রতি-কারের যন্ত্র প্রকৃতি তৈরী করে রাখছেন। গাছ-

পালা হোল বাতাস শোধনের প্রথম অস্ত্র। তারপরও যখন ধূলিকণার ভাগ বাড়তে লাগল, সৃষ্টি হোল পরজীবী উদ্ভিদ অর্কিডের, বাতাস শোধনের জন্য।

তাই এটুকুতো বুঝলে, পরিমিত ধূলোবালি বাতাসে থাকা উদ্ভিদজগতের জন্য প্রয়োজনীয়ই। আর পশু-পাখী মানুষ তাদের নাসিকাযন্ত্রের গঠন ও শ্লেষাঝিল্লির মাধ্যমে সেই ধূলোবালিকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু তার পরিমাণ বেড়ে গেলেই শুরু হয় দূষণের বিপর্যয়।

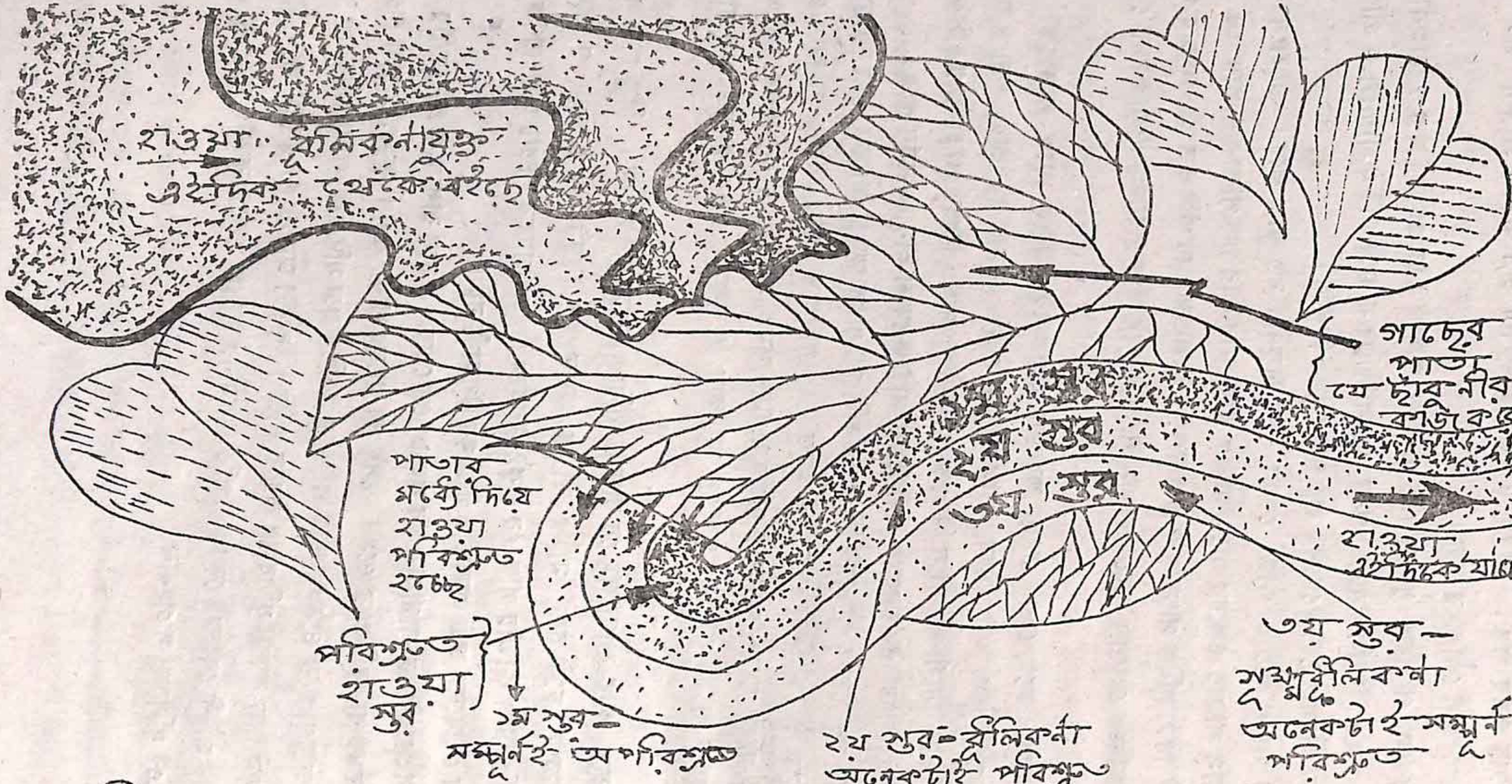
এখন একটু বুঝে নাও, গাছের পাতা কেমন করে ছাঁকুনীর মত কাজ করে। বাতাসের সূক্ষ্ম ক্ষতিকর কণা ও দূষিত গ্যাস পাতার ওপরের গায়ে আটকে যায়, আর তারপর পাতার তলায় যে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত রন্ধ্র থাকে তা দিয়ে দূষিত গ্যাস ও সূক্ষ্ম কণাগুলো বেরুবার সময় পরিশ্রুত হয়, পাতার গায়ে শোষণের ফলে। ২১নং ছবিতে বোঝান হয়েছে বাতাস পাতার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় কেমন করে শোধিত হচ্ছে।

গাছের পাতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শুধু যে ধূলিকণাই আটকে রাখে পাতা তা নয়, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটেসিয়ম, ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম, লৌহ, ম্যানগানিস, তামা, দস্তা ও তারই সংগে এ্যালুমিনিয়ম, ক্যাডমিয়ম, আর্সেনিক, সীসে মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থও গাছের পাতাসংলগ্ন ধূলিকণায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ গাছের পাতা ঐসব দূষণক পদার্থকেও আটকে ফেলে বায়ুকে নির্মল করে।

এখন জানা দরকার সব গাছের পাতারই কি সমান ধূলিকণা ধারক ক্ষমতা আছে? না তা নেই। এ নিয়ে বিদেশে, এদেশে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, হচ্ছে। দেখা গেছে, যেসব গাছের পাতা চওড়া, লম্বাটে ধরনের, তাদেরই দূষিত পদার্থ, গ্যাসযুক্ত ধূলিকণা ধারণ ক্ষমতা বেশী। যেমন, অশ্বথ, বট, আম ইত্যাদি। তবে গুচ্ছ পত্রযুক্ত গাছের পাতায়ও ধূলিকণা আটকায়, তবে কম। যেমন, কৃষ্ণচূড়া গুলমোহর, তেঁতুল ইত্যাদি।

আবার দেখতে হবে, গাছ লাগালেই যে বাতাস, পরিবেশ ভাল হবে তা নয়। কিছু গাছ আছে যার শিকড় বেশী মাটির তলায় চলে যায়, মাটির নীচের জলতলকে কিছুটা শুষে নিয়ে জলতলকে নামিয়ে দেয়। ইউক্যালিপটাস জাতীয় গাছ-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর গাছের পাতায় ধূলিধারণক্ষমতা খুব কম। তাই পরিবেশ শোধনের জন্য এজাতীয় গাছ খুব উপকারী নয়।

আজকাল বনমহোৎসবে গাছ লাগাবার খুব হুজুগ পড়ে গেছে। মনে রাখবে, অপ্রয়োজনীয় গাছ মশা-মাছির, পোকা-মাকড়ের বাসভূমি হয়ে ওঠে। সেই সব গাছের শাখা-প্রশাখা কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি জন্তুদের মলমূত্র ত্যাগের জায়গা হয়ে ওঠে। তাই পরিবেশ উন্নতির জন্য যদি গাছ লাগাতেই চাও তবে মোটামুটি জেনে রাখ কেমন গাছ কতটা ধূলিধারণ করতে পারে। কতটা জায়গা আছে বুঝে-শুনে সেইমত গাছ লাগাও। ৪৫ পৃষ্ঠার সারণী সেজন্যই দেখ। প্রতি বর্গমিটার পাতার ক্ষেত্রে কতটা ধূলিকণা জমে তারই হিসাবে স্থির হয় এই ধূলিকণা সংগ্রহমান।



ছবি - নং — গাছ ধূলিকণাযুক্ত বাতাসকে কিভাবে পরিশ্রুত করছে।

২১ নং চিত্র : গাছ ধূলিকণাযুক্ত বাতাসকে কিভাবে শোধিত করছে

সারণী ঃ নানান গাছের পাতার ধূলিসংগ্রহের ক্ষমতা কত

গাছের চলতি নাম	ধূলিকণার পরিমাণ—গ্রাম প্রতি বর্গমিটার পাতার ক্ষেত্রে		
	পাতার ওপর পিঠে	পাতার নীচের পিঠে	মোট ধূলিকণা
১। অশ্বত্থ গাছ	৬˙৫	৩˙৪	৯˙৯
২। বট গাছ	৬˙২	৩˙০০	৯˙২
৩। আম গাছ	৩˙৪	৩˙৩	৬˙৭
৪। সেগুন গাছ	৪˙১	১˙২৫	৫˙৩৫
৫। দেবদারু গাছ	৩˙৯২	০˙৬৪	৪˙৫৬
৬। শাল গাছ	৩˙৪০	১˙১০	৪.৫০
৭। অর্জুন গাছ	৩˙২৫	১˙২৪	৪˙৪৯
৮। কৃষ্ণচূড়া গাছ	২˙৮	১˙৬	৪˙৪২
৯। পাকুড় গাছ	২˙৬৪	১˙৫৪	৪˙১৯
১০। জামরুল গাছ	২˙৮২	১˙২২	৪˙০৫
১১। অশোক গাছ	২˙৫৬	১˙২২	৩˙৭৮
১২। কদম গাছ	২˙৪২	১˙১৫	৩˙৫৭
১৩। টিউলিপ গাছ	২˙৮২	০˙৭১	৩˙৫৩
১৪। পলাশ গাছ	২˙২০	০˙৮৫	৩˙০৫
১৫। নিম গাছ	২˙২০	০˙৭২	২˙৯২
১৬। সোঁদর গাছ	১˙৮২	০˙৪২	২˙২৪
১৭। তেঁতুল গাছ	১˙৫৬	০˙৫২	২˙০৮
১৮। গুলমোহর গাছ	১˙১২	০˙৩২	১˙৪৪

এসব দেখে-শুনে এটুকুতো বুঝতে পারছ সঠিক গাছ বেশী থাকা মানে কিছু কঠিন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছাড়াই দূষিত ভাসমান পদার্থ ও ধূলিকণা থেকে বাতাসকে নির্মল রাখা। কিন্তু আসলে আমরা কি তাই হোতে দিচ্ছি ?

জনসংখ্যার বৃদ্ধি হচ্ছে। জনবসতি চাই। জঙ্গল কেটে, শস্যভূমিতে জনবসতি তৈরী হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কলকারখানা চাই। আবার সেই জঙ্গল কাটা হচ্ছে। কৃষিভূমিও কিনে নিয়ে কলকারখানা হচ্ছে। ধর দুর্গাপুরের কথাই। বনজঙ্গল, শালবন ভরা সেই বনভূমি। সব কেটেকুটে সাফ হয়ে শিল্পনগরী দুর্গাপুর গড়ে উঠল।

ফলে কি হোল দেখ। গাছ যে অক্সিজেন সরবরাহ করত, বাতাস সেই অক্সিজেন পেয়ে অনেকটা পরিশুদ্ধ হোত, তার কিছুটা হ্রাস পেল। আবার গাছপালা কমে গিয়ে দূষিত ধূলিকণা থেকে বাতাসকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশুদ্ধ করার রাস্তাও অনেকটা বন্ধ হয়ে গেল। ফলে কি হোল, ধূলো আর ধোঁয়ায়, মানে ধূঁয়োয় আকাশ ভরে উঠল। ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলে তৈরী করল ধোঁয়াশা।

এরই সঙ্গে বাতাসের হেরফের হতে লাগল আরও নানান কারণে। নানান উপসর্গে জর্জরিত হয়ে উঠল নিম্নাকাশ ট্রপোস্ফিয়ার।

তাহলে এটাই তো দাঁড়াচ্ছে, প্রকৃতির ভারসাম্যে কোনও একটি জায়গায় আঘাত করলে অন্য জায়গায় অজান্তেই শুরু হবে বিপর্যয়। ভারসাম্য বজায় রাখতে তাই আকাশ-বাতাস, মাটি-জল, শব্দ সবাইকেই সমীহ করে চলতে হবে বৈকি।

এত সব শুনে হয়ত ভাববে, শহর না হয় তৈরী হয়েছে বনজঙ্গল কেটে। তা বলে ভারতবর্ষে তো আর কম বনজঙ্গল নেই। তবে ভাবনা কি ?

কিন্তু ভারতবর্ষেই বনভূমি পৃথিবীর গড় বনসম্পদের তুলনায় অনেক কম। আবার ভারতবর্ষের গড় বনসম্পদ যা আছে, সেই অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ প্রায় অর্ধেক। নীচের সারণীটা দেখ। দেখলেই বুঝবে কতটা বনভূমি কম আছে। আবার সেই কম বনভূমিকেও যখন আমরা নির্মূল করছি তখন নির্মল আকাশ-বাতাস পাবার প্রাকৃতিক যন্ত্রকে নিজেরাই নষ্ট করে ফেলে নিজেদের সর্বনাশ করছি। সারণীটা দেখে সাবধান হবার চেষ্টা কর।

সারণী : বনসম্পদের মান

কোথাকার বনসম্পদ	বনভূমির মোট আয়তন [লক্ষ হেক্টর]	শতকরা হিসাব	মাথা পিছু [হেক্টর]
১। পৃথিবীর	৩৯,৯০৬	৩০%	১.০০
২। ভারবর্ষের	৭৫০	২২%	০.১৩
৩। পশ্চিমবঙ্গের	১২	১৩%	০.০৩
৪। কলকাতা		৬%	

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বনসম্পদ কমছে, বাতাস পর্যাপ্ত অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে ধূলিকণা ধারণক্ষম গাছপালা কমে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডল ধূলিকাময়, রাসায়নিক সূক্ষ্ম পদার্থকণায় বিষময় হয়ে উঠছে।

কিন্তু এই সহজ সত্যটা যদি মনে রাখি যে বনানীই পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, তাহলে পরিবেশ দূষণমুক্তির একটি সহজ পথ আপনা থেকেই আমরা খুজে পাব।

বাতাস দূষণে ক্ষয়ক্ষতি কি ?

সবচেয়ে প্রথমে জেনে নাও বাতাসে কোন কোন গ্যাস, পদার্থ থাকলে কি ক্ষতি করে। এই ছবিটা জানলে বুঝবে কোন কোন গ্যাস, পদার্থকণা থেকে সাবধান হওয়া দরকার।

সারণী : বাতাস দূষণক পদার্থ ও তার ক্ষতিকারিতা [সারণী মুখস্থ করার দরকার নেই]

দূষণক পদার্থ/গ্যাস	কোন মানের চেয়ে বেশী হোলে [থ্রেসহোল্ড মাত্রা]	কি ক্ষতি করে
(১) সালফাইড অক্সাইডের পদার্থকণা	(ক) ৮০—১০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে।	(ক) ৫০ বছরের বেশী মানুষদের মৃত্যু ঘটতে পারে।
	(খ) ১৩০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘন ফুটে। [বার্ষিক গড়]	(খ) স্কুলগামী ছোট ছেলে মেয়েদের নিঃশ্বাস জনিত রোগ হতে পারে।
	(গ) ১৯০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনফুটে। [বার্ষিক গড়]	(গ) স্কুলগামী বাচ্চা ছেলে মেয়েরা ঘন ঘন শ্বাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়।
	(ঘ) ১০৫—২৬৫ মইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনফুটে। [বার্ষিক গড়]	(ঘ) ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে।
	(ঙ) ১৪০—২৬০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনফুটে। [দিন-রাতে গড়]	(ঙ) বৃদ্ধলোকদের ঘন ঘন হৃদকষ্টের কারণ ঘটায়। ব্রংকাইটিস্ রোগের কবলে ফেলতে পারে।
	(চ) ৩০০—৫০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ফুটে। [প্রতি দিনে]	(চ) বৃদ্ধলোকের হৃদকষ্টের রোগ এ ক্ষেত্রে ভীষণ বেড়ে যায়।
	(ছ) ৩০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনফুটে। [প্রতি দিনে]	(ছ) খারাপ ধরনের ব্রংকাইটিস্ রোগের সৃষ্টি করে।
(২) কার্বন মনোক্সাইড	৫৮ মিলিগ্রাম প্রতি ঘনফুটে [৫০ পি. পি. এম] ৮ ঘণ্টায়।	কাজে কুঁড়েমি আসে। দেখতেও অসুবিধা হয়।
(৩) ফটোকেমিক্যাল অক্সিডেন্টস	(ক) ০.০৭ পি. পি. এম।	(ক) দৌড়বীরদের সহজেই ক্লান্ত করে ফেলে।
	(খ) ০.২৫ পি. পি. এম। [দিনের গড়]	(খ) হাঁপানির সৃষ্টি করে।
	(গ) ২০০ মিলিগ্রাম প্রতি ঘনফুটে। [দিনে]	(গ) চোখ জ্বালা করে।
(৪) ওজোন গ্যাস	(ক) ০.০২ পি. পি. এম।	(ক) নাক-গলায় জ্বালা সৃষ্টি করে।
	(খ) ৯.০০ পি.পি.এম। [৩০মিনিটে]	(খ) মাথা ধরা শুরু করায়।
	(গ) ২.০০ পি.পি.এম। [১½ঘন্টা]	(গ) মুখ গলা শুকিয়ে যায়।

ট্রপোস্ফিয়ার বা নিম্নাকাশ দূষিত হয়েই সৃষ্টি করে নানান ধরনের বাতাস দূষণ সমস্যা।

শুধু যে দূষিত গ্যাসই বাতাস দূষিত করছে তা নয়, নানান ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থকণাও বাতাসে ছড়িয়ে থেকে বাতাসকে ভারী, দূষণযুক্ত করে তুলছে।

শহরের বাতাস বিশেষ করে দূষিত হচ্ছে। পেট্রোল ও ডিজেল চালিত গাড়ীর জন্য, কলকারখানার চিমনি-নিঃসৃত ধোঁয়ার জন্য। এছাড়া শহরাঞ্চলের কাছাকাছি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিও বাতাস দূষণের বিশেষ কারণ হয়ে উঠেছে। বাতাস দূষণের শতকরা ১৫ ভাগ কারণ এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। এছাড়া, গৃহস্থ বাড়ীর কয়লা-উনুনও বাতাস দূষণের বিশেষ কারণ বলে পরিগণিত হয়।

দূষিত গ্যাস ছাড়া সূক্ষ্ম ধূলিকণাও বাতাস দূষণের কারণ হয়ে উঠেছে। দেখা গেছে কলকারখানাযুক্ত বড় বড় শহরাঞ্চলে, প্রতি মাসে, প্রতি বর্গকিলোমিটার জমিতে, ত্রিশ হাজার কিলোগ্রাম সূক্ষ্ম ধূলিকণা বাতাস থেকে ঝরে পড়ছে মাটিতে। ধূলিকণা কেমন করে বাতাসে ভেসে বেড়ায়, ঝরে পড়ে, একটু পড়েই বোঝাচ্ছি। মোট কথা, এটুকুই জেনে রাখ এখন, যেসব ধূলিকণার ওজন অপেক্ষাকৃত বেশী তারাই প্রথমে ঝরে পড়ে। আর যেসব ধূলিকণা ওজনে হাল্কা, আয়তনে খুবই সূক্ষ্ম, তারাই ধোঁয়ার আকাশে বহুদিন বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এরাই বেশী মাত্রায় বাতাস দূষণ সৃষ্টি করে।

এই প্রসঙ্গে তোমরা জেনে রাখ, পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতার বাতাস দূষণের ছবিটা কি ? কারা কতটা দূষণ সৃষ্টি করছে ?

(ক) সূক্ষ্ম পদার্থকণা [একে বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হচ্ছে পার্টিকুলেটস্]—এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় আসামী বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি, তারা দিনে ১৫০ মেট্রিক টন পদার্থকণা বাতাসে ছড়াচ্ছে। এর পরের আসামী কলকারখানাগুলি, তাদের দূষণহার ১০৭½ মে. টন। গৃহস্থালীর উনুন ইত্যাদি থেকে পদার্থকণা বাতাসে আসছে ২৫·৩ মে. টন। যানবাহন থেকে সেই অনুপাতে আসছে সবচেয়ে কম, ১·০ (এক) মে. টন দিনে।

(খ) সালফার ডাই-অক্সাইড [SO_2]—দেখা গেছে পরীক্ষায়, এ ব্যাপারেও প্রথম আসামী হচ্ছে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির জন্য দূষণমান হচ্ছে দিনে ৩৬ মে. টন [মেট্রিক টন] ; এর পরে আসছে কলকারখানার দূষণমান, দিনে ১১½ মে. টন। তারপরে বাড়ীঘর, গৃহস্থলীর দূষণমান, দিনে ৫·৯ মে. টন। সবশেষের দূষণ করছে যানবাহন, দিনে ১·৩ মে. টন।

(গ) কার্বন মনোক্সাইড [CO]—এই ক্ষেত্রে দূষণকারীদের চেহারা বদলে গেছে। এই জাতীয় গ্যাসের দূষণ সবচেয়ে বেশী হচ্ছে যানবাহন থেকে, দিনে ১৩৮·৭ মে. টন। তারপর গৃহস্থালী থেকে, দিনে ৩৩৭ মে. টন। সূক্ষ্মমাত্রায় দূষণ সৃষ্টি করছে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি, ২·৩ মে. টন দিনে, কলকারখানায় ২·০০ মে. টন দিনে এই দূষণ হচ্ছে।

(ঘ) নাইট্রোজেন অক্সাইড—এই গ্যাসের দূষণ সবচেয়ে বেশী হচ্ছে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি থেকে, দিনে মোট ১৭.২ মে. টন। তারপর যানবাহন থেকে দিনে মোট ১৫.৬ মে. টন, কলকারখানার থেকে ৭.৩ মে. টন দিনে ও গৃহস্থালী-বাড়ীঘর থেকে ৭.২ মে. টন দিনে।

(ঙ) হাইড্রোকার্বন—এই গ্যাসের সবচেয়ে ক্ষতিকারক অপরাধী কলকারখানা। সেখান থেকে দিনে দূষণ হচ্ছে ৩১.৩ মে. টন। যানবাহন থেকে হচ্ছে ১৮.৩ মে. টন দিনে। বাড়ীঘর-গৃহস্থালী থেকে হচ্ছে ৮.৪ মে. টন দিনে। স্বল্পদূষণ সৃষ্টি করছে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি, ১.১ মে. টন দিনে।

তাহলে এটুকুই বুঝলে, পার্টিকুলেটস্, সালফার ডাই-অক্সাইড, আর নাইট্রোজেন অক্সাইডের সবচেয়ে দূষণ বেশী হয় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি থেকে। কার্বন মনোক্সাইডের দূষণ সবচেয়ে বেশী হয় যানবাহন থেকে। আর হাইড্রোকার্বনের দূষণ বেশী হয় কলকারখানা থেকে।

একটু আগেই বলেছি সালফার-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, ফটোকেমিক্যাল অক্সিডেন্টস্ ইত্যাদি গ্যাসের জন্য মানুষের কি কি ক্ষতি হয়। কিন্তু ক্ষতিটা হয় কিভাবে দেখ।

চলতি ভাবে, কালো বা ধূসর রঙের, নাকজ্বালা করা ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত বায়বীয় পদার্থকে আমরা ধোঁয়া বলি। এই ধোঁয়ার মধ্যে কয়লা ও ছাইএর অজস্র সূক্ষ্মকণা মিলেমিশে থেকে ধোঁয়ার এই রঙ তৈরী করে। ধোঁয়ার রঙ আসলে বর্ণহীন, গন্ধহীন। তবে নানান পদার্থকণা ও গ্যাস মিলেমিশে এর রঙ ও ঝাঁঝালো গন্ধের সৃষ্টি করে। এই মিশ্রিত গ্যাস মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।

কার্বন-মনোক্সাইড এমনি একটি ক্ষতিকারক গ্যাস। অক্সিজেনের ঘাটতির জন্য কার্বন-মনোক্সাইডের প্রাদুর্ভাব ঘটে। শীতকালে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে শুলে, কার্বন-মনোক্সাইডের গ্যাসে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি বছরে বাতাসে প্রায় ২৩০০ লক্ষ টন কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস আসার ফলে বাতাস দূষিত হয়ে উঠছে। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত ইঞ্জিন থেকেই ১৮০০ লক্ষ টন (শতকরা ৮০ ভাগ) কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস পৃথিবীর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। সবচেয়ে বিপদের কথা হচ্ছে এই, কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস একবার তৈরী হলে চট করে বিনষ্ট হয় না, সাত-আট বছর পর্যন্তও অবিকৃত থাকে। শুধু এটুকুই দেখা গেছে, এই গ্যাসের কিছুটা একজাতের ব্যাকট্রিয়া ধ্বংস করে, কিছুটা মিশে যায় উর্ধ্বাকাশে, কিছুটা রূপান্তরিত হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইডে। কিন্তু বেশীর ভাগ কার্বন-মনোক্সাইড রয়ে যায় অবিকৃত। আর এ জন্যেই দেখা যাচ্ছে, দিনে দিনে, বাতাসে এই ভয়ংকর দূষিত গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে।

২নং ক্ষতিকারক গ্যাস বলা যেতে পারে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে। এই গ্যাসের রঙ খয়েরী-হলদে ধরনের, ঝাঁঝালো গন্ধময় ও শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। পেট্রোল ইঞ্জিন আর কলকারখানার ধোঁয়ার সংগেই এই দূষিত গ্যাস বাতাসে এসে মেশে।

এছাড়া বাতাসে আর যে ধরনের দূষিত গ্যাস ছড়িয়ে থাকছে তা পেট্রোল, কয়লা, তেল, কাঠ এসব দাহ্য পদার্থ থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। এরই ফলে নানান জাতীয় হাইডোকার্বন গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে

যাচ্ছে। এরই সংগে প্রচুরভাবে সৃষ্টি হচ্ছে অন্যান্য গ্যাস, সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস, সালফিউরিক এ্যাসিড। সমীক্ষায় দেখা গেছে বছরে প্রায় ৯০ মিলিয়ন টন হাইড্রোকার্বন, আর ৪০ মিলিয়ন টন সালফার-ডাই অক্সাইড গ্যাস পৃথিবীর বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তবে এই গ্যাস বাতাসে দীর্ঘকাল জমা থাকে না। বৃষ্টির জলধারার সাথে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এই গ্যাসের রূপান্তর ঘটে, আর সালফেট সার হয়ে মাটিতে এসে পড়ে। তখন এই সার মাটিতে প্রয়োজনীয় সারের জোগান যোগায়।

এরই সংগে তোমরা আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোন, ধোঁয়াশা বা স্মগ। বড় শহরাঞ্চলে এই ধোঁয়াশা দেখা যায় শীতকালে। কলকাতাতে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে দেখা যায়ই। নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড আর কয়েকটি হাইড্রোকার্বন আর ওজন-গ্যাসের জটিল রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় ধোঁয়াশা। শীতপ্রধান দেশে যেখানে কলকারখানা বেশী আছে, পেট্রোল ইঞ্জিনযুক্ত গাড়ী প্রচুর চলে, সেসব জায়গায় ধোঁয়াশার কবলে বহু লোক মারা যায়।

এরই সংগে আর এক কষ্টকর ক্ষতিকারক শত্রু হচ্ছে ধোধোঁয়া। ধূলো আর ধোঁয়ার মিশ্রণে এই ক্ষতিকারক গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে নানান অসুখের সৃষ্টি করে।

তবে এরই মধ্যে আশার কথা বৃষ্টিপাতের দরুণ বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা দূষিত পদার্থকণা বৃষ্টির জলের সঙ্গে ঝরে পড়ে। দূষিত গ্যাস বৃষ্টিকণার সংগে রাসায়নিক মিশ্রণে রূপান্তরিত হয়ে নেমে আসে মাটিতে। মাটিতে সার হিসাবে খাদ্যরস জোগায়। তবে এটাও জেনে রাখা দরকার, বিশেষ সমীক্ষায় আমেরিকার বিজ্ঞানীরা দেখেছেন বাতাসে ওজোন-গ্যাসের দূষণের জন্য ঐদেশে গমের ফলন শতকরা ১০ থেকে ২৫ ভাগ কমে গেছে। এছাড়া গমের দানাও খুব ছোট হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এও বলছেন সমস্ত ফসলই শতকরা ৯০ ভাগ কম ফলছে ওজোন সালফার ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের দূষণের জন্য। তাই গ্যাসের দূষণ শুধু মানুষদেরই ক্ষতি করছে তা নয়, ফসলেরও ক্ষতির কারণ হচ্ছে।

বাতাস দূষণ কিভাবে হয়

এইবার একটু জেনে নাও বায়ু দূষণ কিভাবে হচ্ছে। বায়ুস্তরের দূষণকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) স্বাভাবিক দূষণ—অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রচলিত নিয়মে যে দূষণ হচ্ছে, আর হবেই, তাই হচ্ছে স্বাভাবিক দূষণ।

এখন দেখ, স্বাভাবিক দূষণ করছে কারা ? অগ্ন্যুৎপাতজনিত গ্যাস, ধূলো, মরচে, ধূলিঝড়, উৎক্ষিপ্ত ধূলো, সমুদ্র-হাওয়ায় উৎক্ষিপ্ত লবণাক্ত ধূলিকণা, বনজংগলে আপনা-আপনি যে আগুন লাগে তার ধোঁয়া, ইত্যাদি এই দলে পড়ে।

(খ) কৃত্তিম দূষণ—বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সভ্যতার অগ্রগতির জন্য নানানভাবে বাতাস দূষণকে বলা হয় কৃত্তিম দূষণ।

এই কৃত্তিম দূষণ সৃষ্টি করে কলকারখানার ধোঁয়া ও উৎক্ষিপ্ত দূষিত পদার্থকণা, মটর, বাস ইত্যাদি পেট্রোল-ডিজেল বাহিত যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস, রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ থেকে নির্গত গ্যাস, রেডিও-এ্যাকটিভ পদার্থ, আকাশস্তরে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাতাস দূষণ এই কৃত্তিম দূষণ সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাক, কোন কোন কারণে বাতাস দূষণ বাড়ছে কমছে। বায়ুবিজ্ঞানীদের মতে কারণগুলো হচ্ছে—

(ক) বায়ুর গতি (স্পীড) ও প্রবাহনের দিক।

(খ) বাতাসের প্রসারণের প্রভাব।

(গ) বায়ুস্তরের উচ্চতার সংগে সংগে উত্তাপের হেরফের।

(ঘ) মিশ্রণের গভীরতার প্রভাব।

(ঙ) বায়ুস্তরের ভাসমান পদার্থকণার নীচের দিকে পতনহার।

এবার এক একবারে বোঝাচ্ছি ওপরের কারণগুলো কেমন করে বাতাস দূষণ প্রভাবান্বিত করে।

(ক) বায়ুর গতি ও প্রবাহন দিক—বাতাসের মধ্যে যে দূষিত পদার্থ থাকে তা বাতাসের বেগের ধাক্কায় প্রথমে ওপরে উঠে যায়, আর তারপর সামনেও এগিয়ে যায়। বাতাসের বেগ যত বেশী হবে, বায়ু-দূষিত পদার্থকণা তত বেশী ওপরে উঠে আকাশের বেশী বিস্তৃত পরিধিতে ছড়িয়ে যাবে। এরই ফলে দূষিত-কণা বৃহত্তর বায়ুস্তরের সংগে মিশে, বেশী তরলিত বা ডাইলিউটেড হয়ে অনেকটা পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

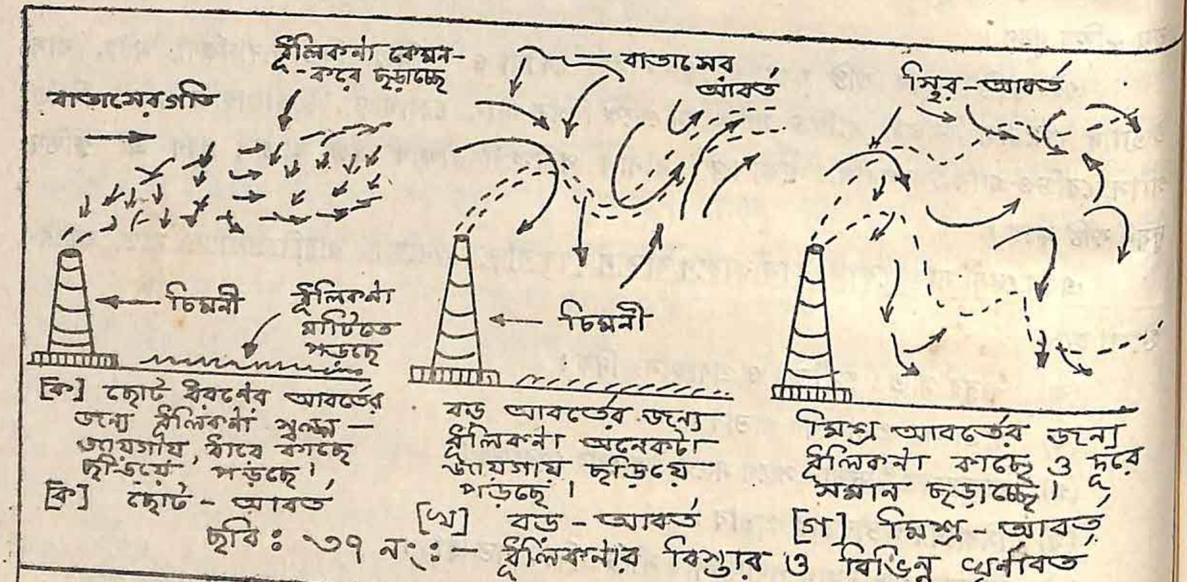
দেখা গেছে, বায়ুর গতি মাটি থেকে ১০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত দ্রুতলয়ে বাড়তে থাকে। কিন্তু এই ১০ মিটার উচ্চতা স্তরের ওপরে গেলে বাতাসের গতি খুব ধীরে বাড়ে।

এরই সংগে জায়গার অবস্থান আর দিনরাতের উত্তাপের হেরফেরও বায়ুর গতির পরিবর্তন ঘটায়। সূর্যরশ্মির উত্তাপে দিনে, বাতাসের তাপপ্রবাহে উত্তালতা সৃষ্টি হয়। ফলে বাতাস আর ধূলিকণার ঘন মিশ্রণ ঘটে। কিন্তু রাত্রে, বাতাসের তাপপ্রবাহ কম থাকায় বাতাস অনেকটা স্থির থাকে। ফলে রাত্রে বাতাস আর ধূলিকণার মিশ্রণ অল্পমাত্রায় হয়।

এ ছাড়াও বাতাস আর ধূলিকণার মিশ্রণ ঘটে কৃত্তিমভাবে। অর্থাৎ কলকারখানার উদ্গত ধোঁয়া বাতাসের সংগে কৃত্তিম মিশ্রণ সৃষ্টি করে।

উত্তাল বায়ুপ্রবাহের চেহারা জানতে হলে, ঘূর্ণিবায়ু অর্থাৎ আবর্ত বা "এডিমোশনের" চেহারাটা কি জান? মনে রাখবে আবর্ত বা ঘূর্ণিবায়ুই বাতাসের দূষিত ধূলিকণাকে বৃহত্তর বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দিয়ে মিশিয়ে দিতে সাহায্য করে। আর তারই ফলে ধূলিকণার ঘনত্ব বাতাসে কমে যায়।

বিভিন্ন ধরনের ঘূর্ণাবর্তে বাতাসে কেমন ধূলিকণার বিস্তার মিশ্রণ ঘটে তা দেখান হোল ২২নং ছবিতে।



২২ নং চিত্র : ধূলিকণার বিস্তার ও বিভিন্ন ঘূর্ণাবর্তের কাজ

(খ) বাতাসের প্রসারণের প্রভাব (ডিফিউশন)—আপনা থেকেই বাতাস প্রসারিত হোতে

পারে। বাতাসের এই প্রসারনিক ক্ষমতার জন্যই বাতাস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করে, আকাশে বেলুন যেমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করে ঠিক তেমনিভাবে। এরই ফলে ধূলিকণা মিশ্রিত দূষিত বাতাস প্রথমে উঠতে থাকে, আর তারপর ধূলিকণাযুক্ত ভারী পদার্থ নীচে পড়তে থাকে।

ব্যাপারটা ঠিক গ্যাসভর্তি বেলুনের মত। গ্যাসভর্তি বেলুন যেমন প্রথমে সোঁ-সোঁ করে সোজা আকাশে উঠে যায়, তারপর আকাশের একস্তরে পৌঁছে গেলে বেলুনের পাতলা আস্তরণ দিয়ে গ্যাস ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে যায়, আর বেলুন নীচে নামতে থাকে ঠিক তেমনিই ধূলিকণা বাতাসের ওপরের এক স্তরে পৌঁছে গেলে আর ওপরে উঠে না, বরং নীচে ছড়িয়ে পড়ে। আবর্ত তখন তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে ফেলে দেয়। ২২ নং ছবিতে এই ব্যাপারটাই বোঝান হয়েছে।

(গ) বাতাসের উত্তাপের হেরফের—বায়ুস্তরে নিম্নাকাশে, ট্রপোস্ফিয়ারে প্রথমে উত্তাপ কমবে। ৫০ ডিগ্রী থেকে ৮০ ডিগ্রী মাইনাস সেন্টিগ্রেডে উত্তাপ নেমে আসবে ভূপৃষ্ঠ থেকে ট্রপোপাস স্তরে পৌঁছালে (ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২ কিলোমিটার উঁচু বায়ুস্তরে), তারপর মধ্যাকাশ ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে (ভূপৃষ্ঠের ১২ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে ৬০ কি. মি. উচ্চতার স্তর পর্যন্ত) উত্তাপ বাড়বে। সূর্যরশ্মি থেকে লাল উজানি রশ্মি (ইনফ্রা—রে) ওজোন গ্যাস সংগ্রহ করে এই উত্তাপ বাড়ায়। ষ্ট্র্যাটোপোস বায়ুস্তর থেকে মেসোপোস বায়ুস্তর পর্যন্ত অর্থাৎ উর্ধ্বাকাশ মেসোস্ফিয়ারে (ভূপৃষ্ঠের ৬০ কিমি উচ্চতা থেকে ৯০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত) উত্তাপ আবার কমতে থাকবে, আর মেসোপোস বায়ুস্তরে প্রায় ৮০° ডিগ্রী মাইনাসে নেমে আসবে। কিন্তু মেসোপোস বায়ুস্তর পার হয়ে মহাকাশ থার্মোস্ফিয়ারে পৌঁছালে উত্তাপ আবার বাড়তে থাকবে।

এই সংগে এটা জেনে রাখ, নিম্নাকাশ বায়ুস্তরের উপাদানিক চেহারা একই রকমের। আর থার্মোস্ফিয়ার উর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তরে বাতাসের চাপ খুব কম, ঘনত্বও খুব কম।

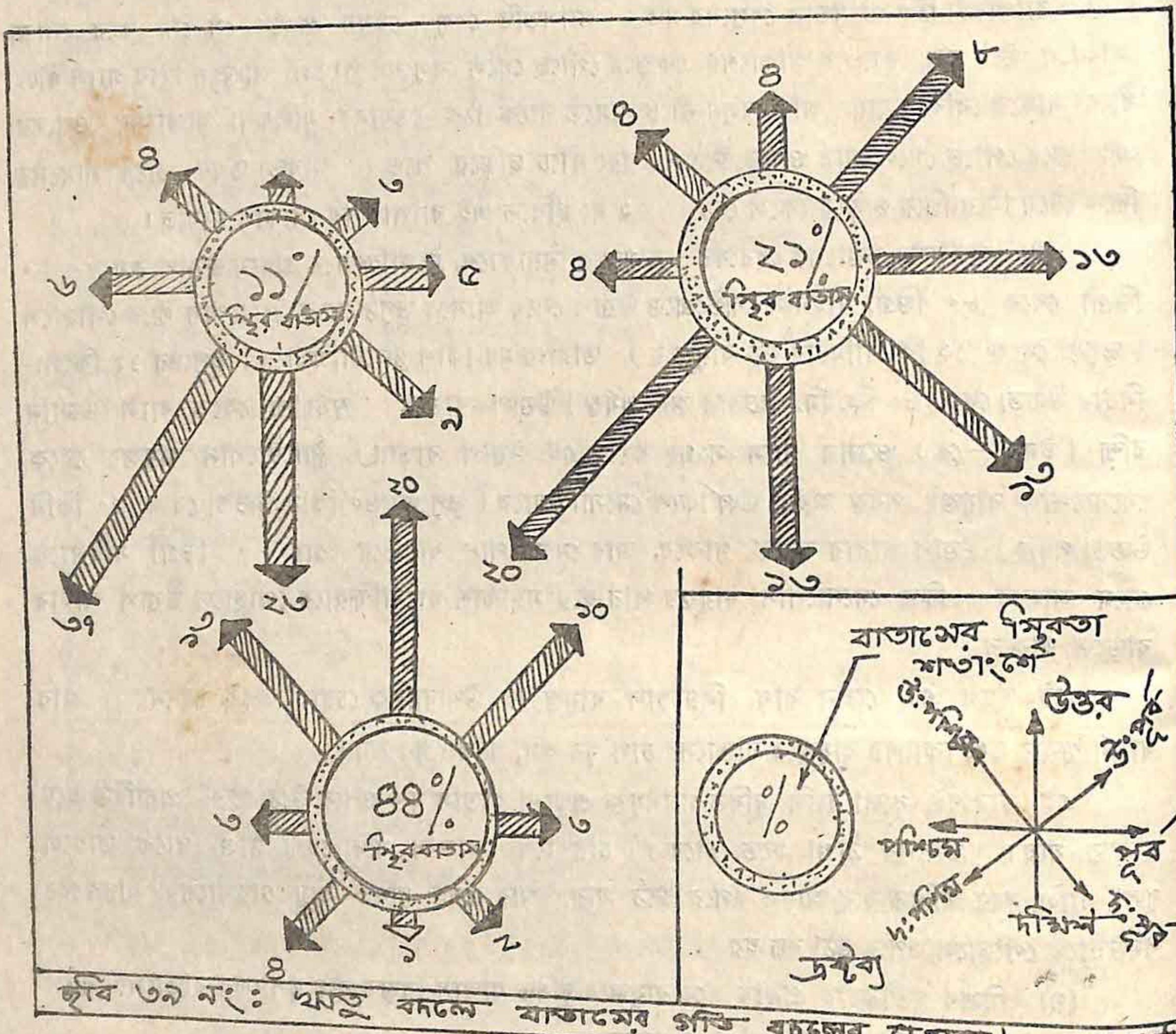
এই কারণেই, ধূলো-বালি, দূষিত গ্যাসযুক্ত শুকনো বাতাস যত ওপরে উঠে, ততই প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে যায়। তারপর ঠাণ্ডা হতে থাকে। চারপাশের বাতাস যদি বেশী ঠাণ্ডা থাকে তাহলে ধূলা, বালি, দূষণ মিশ্রিত বায়ু আরও ওপরে উঠে যায়, আর সেই দূষিত বায়ু চারপাশের বায়ুস্তরের সমউত্তাপে পৌঁছালে ওপরে উঠা বন্ধ হয়।

(ঘ) মিশ্রণ গভীরতার প্রভাব—যে বায়ুস্তরে দূষিত বাতাস বিস্তৃত হয়ে চুপাশের বাতাসের সংগে মিশে যায়, তাকে বলে মিশ্রণ গভীরতা বা মিশ্রণস্তর।

মিশ্রণ-গভীরতার স্তরকে চেনার উপায় হচ্ছে আকাশের সবচেয়ে নীচুস্তরে যে মেঘ ভেসে বেড়ায়, ঠিক তার ওপরেই হচ্ছে, মিশ্রণস্তরের শুরু। অর্থাৎ হালকা মেঘের ওপরেই থাকে মিশ্রণ গভীরতার প্রারম্ভিক স্তর।

দিনের উত্তাপের হেরফের ও ঋতু বদলের সংগে সংগে মিশ্রণ-গভীরতার স্তরেরও বদল হয়। সেটা

আকাশের দিকে তাকালেই তোমরা বুঝতে পারবে, কখনও মেঘের দল খুব নীচে নেমে আসে, কখনও অনেক ওপরে উঠে যায়। মিশ্রণ গভীরতা যত বাড়বে, অর্থাৎ যে বায়ুস্তরে এই মেঘের চলাফেরা চলে তার গভীরতা যত বেশী হবে, ততই বাতাসের দূষিত পদার্থ বায়ুস্তরে ভালভাবে মিলেমিশে দূষণ মুক্ত হবে।



২৩ নং চিত্র: ঋতু বদলে কলকাতার বাতাসের গতি বদলের চেহারা

(ঙ) পদার্থ কণার পতন—বৃষ্টির জল বাতাসে ছড়িয়ে থাকা দূষিত পদার্থকণাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে। বায়ুস্তরে মিশে থাকা গ্যাস, বৃষ্টির জল বা জলীয় বাষ্পকণার সংগে মিশে ধীরে ধীরে নীচে নামে

ও ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। অর্থাৎ এই পতনোন্মুখ বৃষ্টি বা বায়ুস্তরধৌত জলকণা যখন নীচে নামে, তখন আবার নীচের বায়ুস্তরকে কিছুটা দূষিত করে। এভাবে ওপরের সংগে নীচের বায়ুস্তরের মিশ্রণ চলে, আর শেষকালে ওপরের নির্মল বায়ুস্তর নীচের বায়ুস্তরকে জলকণা বা বৃষ্টির জলের সাহায্যে দূষণমুক্ত করে দেয়।

এত সব কথা জানার পর একটা কথা কিন্তু জানতেই হবে, ঋতু বদলে আকাশস্তরে কি ঘটে। ঋতু বদলে বায়ুর গতির পরিবর্তন হয়। ধর বাতাস যে জায়গায় গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ থেকে পশ্চিমদিকে বহুদূরে দূষিত ধূলিকণাযুক্ত পদার্থকে টেনে নিয়ে যেত, বর্ষাকালে ঠিক সেই জায়গাতেই বাতাস ধূলিকণাকে অত দূরে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। আবার শীতকালে সেই জায়গায়ই বাতাস উত্তরমুখী হয়ে ধূলিকণাকে টেনে নিয়ে যাবে উত্তরের দিকে। তাই বাতাস দূষণের কথা বিচার করতে গেলে সেই জায়গায় সারা বছরের আবহাওয়ার গতিবিধি, কোন ঋতুতে কোন দিকে কত গতিতে যায় জানা দরকার। সেটা জানলে চারপাশের কতটা জায়গা জুড়ে দূষণ প্রভাব ঘটবে বুঝতে পারা যাবে। তা না হোলে দূষণরোধের পন্থাও ঠিক করা সম্ভব হবে না।

ব্যাপারটা বোঝবার জন্য কলকাতা শহরের বাতাসের গতি সারা বছর জুড়ে কেমন, তা দেখিয়েছি ২৩নং ছবিতে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, গ্রীষ্মকালে শতকরা ১১ ভাগ বাতাস স্থির থাকে, ৮৯ শতাংশ চারদিকে ছড়িয়ে যায়। তার মধ্যে ৩৭ শতাংশ ছড়ায় দক্ষিণ পশ্চিমে, ২৩ শতাংশ ছড়ায় দক্ষিণে। আর চারপাশে স্বল্প মাত্রায় ছড়ায়, ২ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে।

সেই বাতাসই বর্ষাকালে ২১ শতাংশে স্থির থাকে, ৭৯ শতাংশ ছড়িয়ে যায়। এবার দক্ষিণ পশ্চিমে ২০ শতাংশ ছড়ায়, দক্ষিণ থেকে পূবে ১৩ শতাংশ ছড়ায়। আর পূব থেকে পশ্চিমে ৪ থেকে ৮ শতাংশ মত ছড়ায়।

শীতকালে বাতাস আরও স্থির হয়ে এল। ৪৪ শতাংশ বাতাস তখন স্থির, আর ৫৬ শতাংশ চার পাশে ছড়িয়ে পড়ছে। এবার উত্তরে ছড়াচ্ছে ২০ শতাংশ, উত্তর পূবে ১০ শতাংশ, উত্তর পশ্চিমে ১৩ শতাংশ। আর পশ্চিম থেকে পূবে ৪ থেকে ১ শতাংশ বাতাস ছড়াচ্ছে।

অর্থাৎ, শীতকালে বাতাস বেশী স্থির থাকায় দূষণ হয় বেশী। আর গ্রীষ্মকালে বাতাস বেশী চলাচল করে বলে বাতাস দূষণ হয় কম। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে দূষিত পদার্থ প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আর শীতকালে যাচ্ছে উত্তরে।

বাতাস দূষণ প্রসংগে জেনে রাখ, সালফার ডাই অক্সাইড বায়ু দূষণের সর্বোচ্চ মাত্রা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঠিক করেছেন ৪০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে। অবশ্যি এই মান বেশীর ভাগ দেশই রাখতে পারছে না বলে প্রতিবেশ সংরক্ষণ সংস্থার মতে এই মান ৮০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে (বার্ষিক গড়) হলেও বায়ু দূষিত নয় বলা যেতে পারে। কিন্তু আসলে কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি জান? পৃথিবী জুড়ে বাতাস দূষণের ছবিটা পর পৃষ্ঠায় দেখ—

শহর—সালফার ডাই-অক্সাইড মান, বাতাসে মাইক্রোগ্রাম ঘনমিটার (বার্ষিক গড়)		শহর—সালফার ডাই-অক্সাইড বাতাসে মাইক্রোগ্রাম ঘনমিটার (বার্ষিক গড়)	
১। মিলান (ইতালী)	৬০০	৯। নিউইয়র্ক, ম্যানহাটন (আমেরিকা)	১১০
২। লণ্ডন শহর (ইংল্যাণ্ড)	২৫০	১০। আমস্টারডাম (হল্যাণ্ড)	৮০
৩। ব্রাসলেস্ (বেলজিয়ম)	১৭০	১১। স্টকহলম (নরওয়ে)	৭০
৪। টরেনটো শহর (কানাডা)	১৭০	১২। ডেনিস শহর (ইতালী)	৭০
৫। বৃহত্তর লণ্ডন (ইংল্যাণ্ড)	১৫০	১৩। লস্ এ্যাঞ্জেলস্ (ইতালী)	৭০
৬। লিগ (পশ্চিম জার্মানী)	১৩০	১৪। কোপেনহেগেন (সুইডেন)	৬০
৭। ডেনিস শিল্পাঞ্চল (ইতালী)	১৩০	১৫। নিউইয়র্ক রিচমণ্ড (আমেরিকা)	৫০
৮। প্যারিস (ফ্রান্স)	১১০	১৬। টরেনটো আবাসিক অঞ্চল (কানাডা)	৩০

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুই শহর কলকাতা আর হাওড়ার বাতাস দূষণের চেহারাটাও একটু জেনে রাখ এই সংগে। দিনে কত মেট্রিকটন দূষণক পদার্থ বাতাসে ছড়াচ্ছে এই দুই শহর থেকে একঝলক দেখে রাখ।

মূল দূষণক পদার্থ [এপ্রিল ১৯৭৭ থেকে মার্চ ১৯৭৮]	কলকাতা মে. টন দিনে	হাওড়া মে. টন দিনে	এই দুই শহরের মোট মান মে. টন দিনে	শতাংশ
১। ভাসমান পদার্থকণা	৪১১	১৪৬	৫৫৭	৪৩%
২। সালফার ডাই-অক্সাইড	৭৬	৪৬	১২২	৯%
৩। কার্বন মনোক্সাইড	২৮০	১৬৮	৪৪৮	৩৫%
৪। হাইড্রোকার্বন	৮১	২১	১০২	৮%
৫। অক্সাইডস অফ নাইট্রোজেন	৪৭	২৩	৭০	৫%

জলই জীবন

একটু আগেই বলেছি বৃষ্টির জলের একান্ত দরকার বাতাস দূষণ দূর করার জন্য। কিন্তু শুধু কি সেই কাজেই বৃষ্টির জল লাগে ? না, তা নয়।

পরিবেশ সংরক্ষণে জলের মত অমূল্য আর কিছু নেই। জল ছাড়া জীব-জন্তু, পশুপাখী, গাছপালা কিছুরই বাঁচা সম্ভব নয়। জলের তাই অন্য নাম "জীবন"। তাই এই জীবনদায়ী সম্পদ জলকে খুশীমত ব্যবহার করে, অপচয় করে, দূষিত করে আমরা নিজেদেরই বিপর্যয় আনছি। এ ব্যাপারে আমরা যদি আর বেশী অবহেলা করি, তবে একদিন আসবে যখন শুধু জলের জন্যই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

অনেকেই হয়ত তোমরা ভাবছ পৃথিবীর যখন তিনভাগই জল তখন জলের আর ঘাটতি কোথায় ? যত খুশী, যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিই না জলকে। জলের তো আর দাম নেই ? এসবই কিন্তু ভুল ধারণা। পরিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করতে খরচা লাগে বৈকি। আর পশুপাখী, জন্তু-জানোয়াররা, যে জল খায় তা মিষ্টি জল হোতে হবে, নোন্‌তা হলে চলবে না। আর গাছপালা উদ্ভিদের জন্য বৃষ্টির জলও চাই, পরিবাহিত জলও চাই, তবে তা দূষিত জল হলে চলবে না।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মতে জলের দূষিতকরণ আর অপচয় যদি অচিরে বন্ধ না হয় তাহলে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পানীয় জলের হাহাকার শুরু হবে।

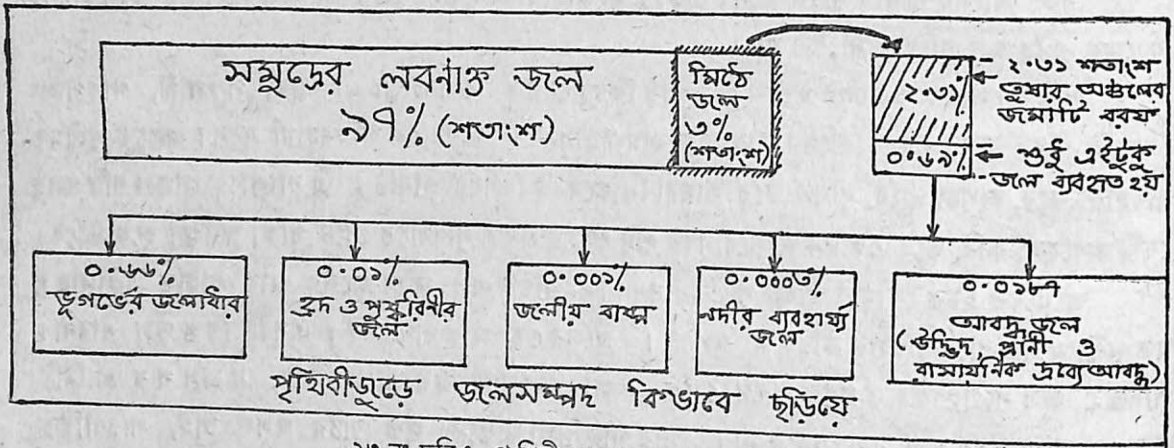
পশুপাখী, কীটপতঙ্গের দেহের ও উদ্ভিদের শতকরা ৬০ থেকে ৯০ ভাগই জলীয় অংশ। মল-মূত্র-ঘাম বা বাষ্পাকারে ঐ জল নির্গত হয়, আর তা পূরণের জন্যই জীবের জলের দরকার হয় প্রচুরভাবে। কিন্তু পৃথিবীর বেশীরভাগ জুড়ে জল থাকলেও কতটুকু জলকে ব্যবহার করা যায় সে খেয়াল আমরা রাখিনি, তাই এই বিপদ।

সেজন্যই জানা দরকার পৃথিবীর জলসম্পদের পরিমাণ কি ?

(১)	পৃথিবীর জলসম্পদ	১,৩৮·৬ কোটি ঘনকিলোমিটার
(২)	মিঠে জল (ফ্রেস্ ওয়াটার)	৩·৫ " "
(৩)	ভূ-খণ্ড থেকে যে জল সমুদ্রে পড়ছে (এই জল প্রতি বছরে পুনঃ সংযোজিত হয়)	৪৭,০০০ ঘনকিলোমিটার
(৪)	বাষ্পীকরণের সমতুল্য বার্ষিক বৃষ্টিপাত	৫,৭৭,০০০ "
(৫)	সমুদ্রে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	৪,৫৮,০০০ "
(৬)	ভূখণ্ডে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	১,১৯,০০০ "

অর্থাৎ দেখাই যাচ্ছে, পৃথিবীর মোট জলভাণ্ডার প্রায় ১৪০ কোটি ঘনকিলোমিটার হলেও মিঠে জলের পরিমাণ মাত্র ৩·৫ কোটি ঘনকিলোমিটার। অর্থাৎ, ২·৫৩ শতাংশ। আর বৃষ্টির যে জল ভূখণ্ডে, বা সমুদ্রে পড়ে প্রতিবছরে জলভাণ্ডার বাড়াচ্ছে তার পরিমাণ প্রায় ০·৪৭ শতাংশ। অর্থাৎ, পৃথিবীর মোট

জলের ৯৭ শতাংশ নোনা জল, আর অবশিষ্ট তিন শতাংশ জলের মধ্যে ২.৩১ শতাংশই হচ্ছে মেরু অঞ্চলের তুষার, যা জমে স্রেফ বরফই হয়ে আছে। তাই মাত্র ০.৬৯ শতাংশ জলকে (৯৫ লক্ষ ঘন-কিলোমিটার) আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারছি। ব্যাপারটা ২৩নং ছবি দেখে আর একবার বুঝে নাও।



২৩ নং ছবি : পৃথিবী জুড়ে জলসম্পদের ছবি

এই ছবি থেকে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে খুব সামান্য মাত্র জলের ওপর উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতকে বেঁচে



২৪ নং ছবি : প্রাণিজগতের জলের চাহিদা

থাকতে হচ্ছে। এরই সংগে কৃষিকার্য, শিল্পেও জল ব্যবহৃত হচ্ছে। এক পলক চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক শিল্প ও প্রয়োজনীয় ক্ষেতী কাজে কতটা জল দরকার হয়।

উৎপন্ন খাদ্য (প্রতি ৪৫৬ গ্রামের জন্য)	জলের পরিমাণ (লিটার)
১। গম	২৭০
২। ধান	৯০০-১১০০
৩। দুধ	৩০০০
৪। মাংস	১০০০-২৫০০

উৎপন্ন শিল্প (প্রতি টনে/সংখ্যায়)	জলের পরিমাণ (টনে)
১। ইস্পাত—টন প্রতি	১৫০ টন
২। কাগজ—ঐ	২৫০ টন
৩। মটরগাড়ী—১টি	৪০,০০০ গ্যাঃ
৪। অপরিশোধিত তেল—১টন	১৮০ টন
৫। নাইট্রেট সার—ঐ	৬০০ টন

এই যে জল পশু-পাখী, মানুষ, উদ্ভিদ বা, শিল্পের জন্য লাগছে, ব্যবহারের পর সেই ব্যবহৃত জল দূষিত হয়ে আবার ফিরে আসছে নদী-নালা-সমুদ্রে। আমরা সেই দূষিত জলকে পরিশুদ্ধ করে যদি আবার কাজে না লাগাতে পারি, তবে দ্রুত মিঠে জলের জলভাণ্ডার কমে যেতে থাকবে। শুধু তাই নয়, এই দূষণযুক্ত জল পরিবেশে জলজ প্রাণীর, জলজ-গুল্মের, এমনকি মানুষ, পশুপাখীরও জীবন বিষাক্ত করে দেবে। দূষণযুক্ত জল ব্যবহার করে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে। শুনলে অবাক হবে, পৃথিবীতে গড়ে প্রতিদিন শুধু দূষিত জল ব্যবহার করেই লোক মারা যাচ্ছে প্রায় ২৫,০০০ জন। ব্যাপারটা ভয়ংকর নয় কি ?

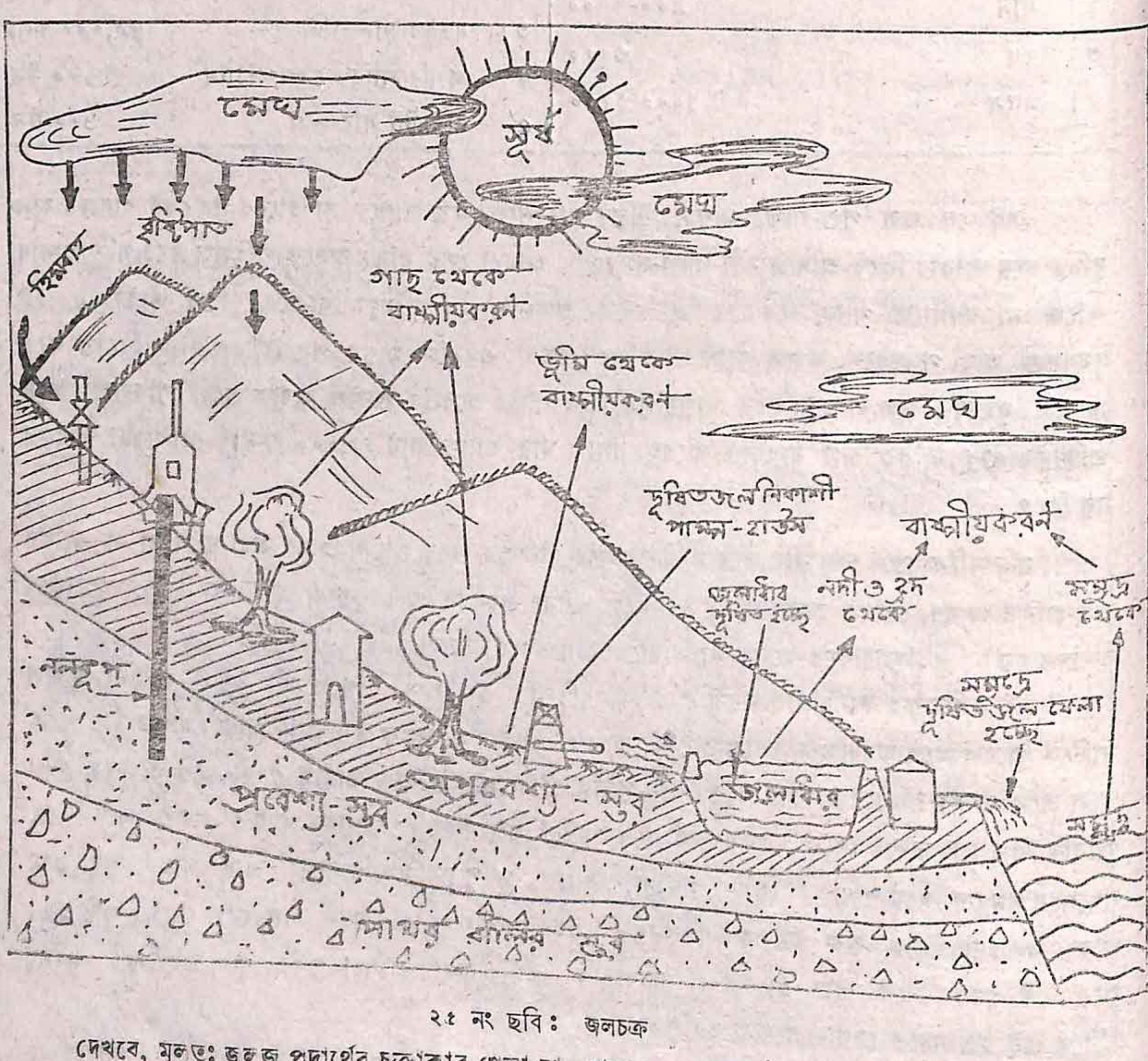
যদি সঠিক পথে চলা যায় তবে দূষিত জলকে পরিশুদ্ধ করে শুধু ব্যবহারই করা যাবে তা নয়, দূষিত জল-জনিত দূষণ রোধও হবে। এই প্রসংগে জানা দরকার জল কেমন করে, নানানভাবে ঘুরেফিরে ব্যবহৃত হয়। এই ঘুরেফিরে জলের কার্যধারাকে বলা হয় জলচক্র।

এই জলচক্রের কার্যধারার জন্যই মেঘ হয়, বৃষ্টিপাত হয়, হিমবাহ গলে নদী হয়। নদীর সেই জল মাটিতে প্রবেশ করে ভূমধ্যস্থ জলভাণ্ডার তৈরী করে। সেই জল নলকূপ মাধ্যমে আমরা মাটির নীচ থেকে তুলে এনে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করি। ভূ-পৃষ্ঠের ওপর যে জল পড়ে তারাই তৈরী করে জলাশয়, হ্রদ। আবার কিছু জল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গড়িয়ে, নদীপথে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এছাড়া ব্যবহৃত জলও ঘুরে-ফিরে, সবশেষে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এছাড়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের জল, ভূ-পৃষ্ঠের জল, জলাশয় আর গাছপালায় জমে থাকা জলকণা থেকে শুরু হয় বাষ্পীয়করণ। এই বাষ্পীয়করণের ফলে বায়ুমণ্ডলে মেঘের সৃষ্টি হয়। পরে এই মেঘ থেকে শুরু হয় আবার বৃষ্টিধারা। এই চক্রমাণ কার্যধারাকেই বলে জলচক্র। ২৫নং ছবিতে এই জলচক্রকে দেখান হয়েছে ৬০ পৃষ্ঠায়।

এই জলচক্রের কাজ চলে পরিবেশ ভারসাম্যের জন্য। পরিবেশ তার ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য, দিনরাতের তাপমাত্রার হেরফেরে, সমুদ্রের জলস্তর আর পৃথিবীর ভূ-স্তরের মধ্যে বায়ুপ্রবাহের চক্রাকার

চলাচল শুরু করে দেয়। এই চক্রাকার খেলায় বায়ুস্তর ও ভূ-স্তরের অণু-পরমাণুদের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।।

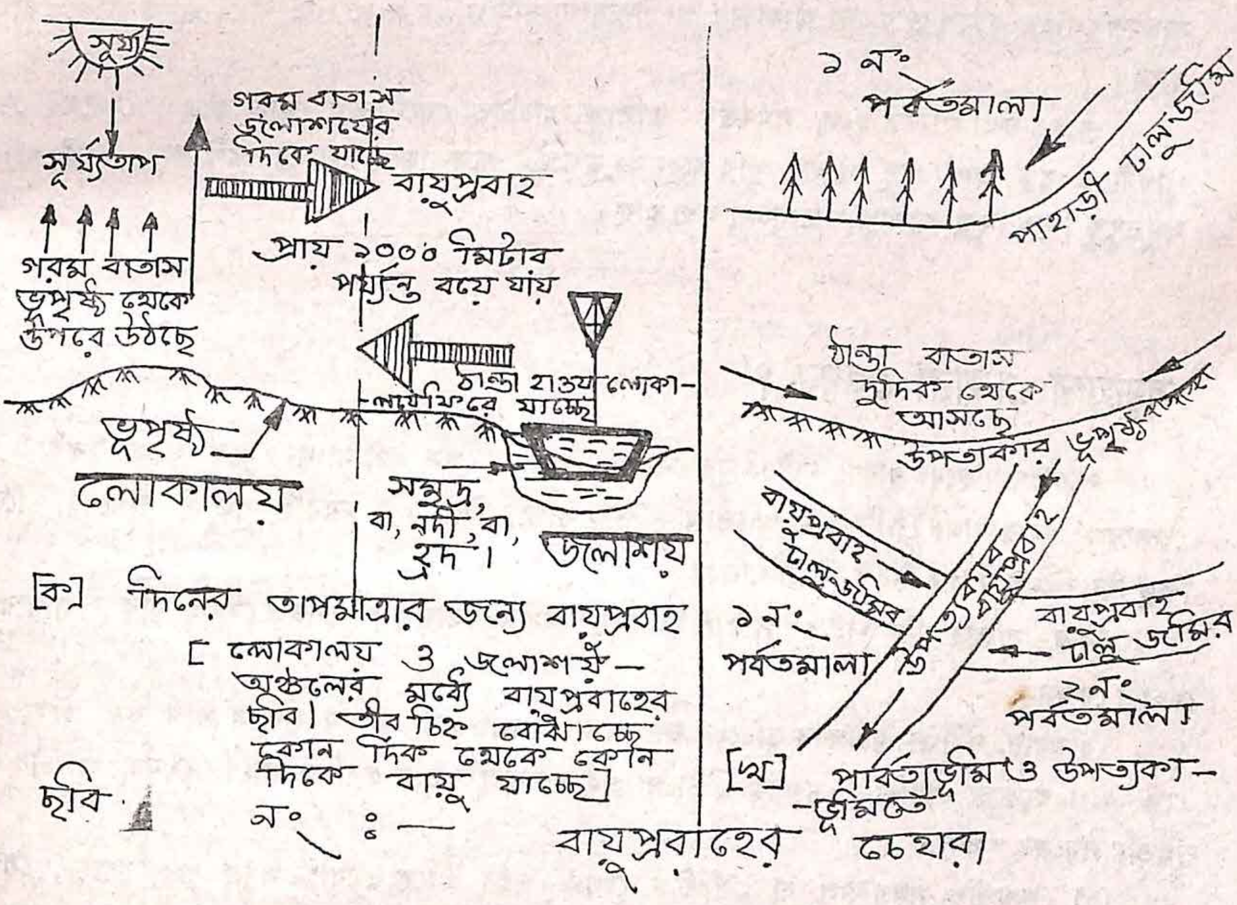
দিনরাতের তাপমাত্রার হেরফেরে সমতলভূমিতে একরকম, আর পার্বত্য উপত্যকায় অন্য ধরনের বায়ু চলাচল ঘটে। এই চলমান বায়ুপ্রবাহ কখনও জনবসতিময় লোকালয়ের ও শিল্পাঞ্চলের গরম ও নানান দূষিত ভাসমান পদার্থযুক্ত বাতাসকে বয়ে নিয়ে যায় নদী ও সমুদ্রপ্রান্তের শীতল বায়ুস্তরের দিকে। আবার শীতল বায়ুস্রোত সমুদ্র বা নদীপ্রান্ত থেকে ধেয়ে আসে লোকালয়ের দিকে। ব্যাপারটা ২৫নং ছবিতে বোঝান হয়েছে ৬১ পৃষ্ঠায়।



২৫ নং ছবি: জলচক্র

দেখবে, মূলতঃ জলজ পদার্থের চক্রাকার খেলা বা বায়ুমণ্ডলের ভূ-পৃষ্ঠ ও জলস্তরের মধ্যে প্রবাহণ-খেলা সঠিকভাবে হলেই তবে বায়ুস্তর, ভূ-পৃষ্ঠ ও শিলাস্তরের বিশুদ্ধতা সঠিকভাবে আসে। এর কারণ,

এই যে ঘূর্ণাবর্ত চলছে, তার ফলে মূলতঃ চার ধরনের উপাদান এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত হচ্ছে। এরাই বাতাসের শুদ্ধতা, নদী-জলের নির্মলতা অনেকটা স্থির করছে। এই চার উপাদান হচ্ছে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও গন্ধক (সালফার)। বায়ুপ্রবাহের চক্রাকার ঘূর্ণাবর্তের সংগে এই মুখ্য চারটি উপাদানও চক্রাবর্তপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের কাজকারবার কি পড়ে জানবে।



২৬ নং ছবিঃ বায়ুপ্রবাহের চেহারা

এর সংগে একটা খবর জেনে রাখ, পৃথিবীজুড়ে কতখানি জল নানানভাবে আকাশ থেকে নেমে আসছে মাটিতে, সাগরে। আর তার মধ্যে কতটাই বা বাষ্প হয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে আকাশে। এ ব্যাপারে হাচিনসন সাহেব এক হিসেব-নিকেশ করছেন।

এই হিসাব-নিকাশ করার জন্য হাচিনসন সাহেব যে সংখ্যামান ব্যবহার করলেন তা হোল জিওগ্রামস্। জিওগ্রামস্ মানে কি? জিওগ্রামস্ হচ্ছে ১-এর পিছনে ২০টা শূন্য দিলে যত গ্রাম হবে তাই। সোজা কথায়—১,০০০০০,০০০০০,০০০০০,০০০০০ গ্রামস্।

এটাই বুঝিয়েছেন হাচিনসন সাহেব যে বছরে ৪·৪৬ জিওগ্রামস্ জল পড়ছে পৃথিবীর নানান

জায়গায়। এর মধ্যে ৩·৪ জিওগ্রামস্ মত জল পড়ছে শুধু সমুদ্র বুকেই। আর ভূ-পৃষ্ঠের মাটিতে পড়ছে ১·০০ জিওগ্রাম মত।

এসব কথা থেকে এটুকু বুঝলে, জল সবার কাছেই জীবনস্বরূপ। সেই জল অনেকটাই ঘুরে-ফিরে আসছে সমুদ্রে, মাটিতে। কিছুটা আকাশ-বাতাস, ভূ-মধ্যস্থ জলস্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এদের যথাযথ সংরক্ষণ শোধন করলে তবে তো আমাদের ব্যবহারযোগ্য সামান্য যে জলভাণ্ডার আছে তাকে টিকিয়ে রাখা যাবে।

জলের কথা জানতে হলে, সমুদ্রের কাজ-কারবারটাও জেনে রাখ ছোট্ট করে। দেখলেই তো পৃথিবীতে যত জল এসে পড়ছে, তার মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠেই এসে পড়ছে সবচেয়ে বেশী জল। তাই এবার সমুদ্রকে নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা করা যাক্।

সমুদ্রের চেহারা কেমন ?

সাধারণ মানুষের ধারণা, নদীতে যত নোংরাই ফেলি না কেন, নদী সাগরের বুকে তাকে ঠিকই নিয়ে ফেলবে। আর সাগর তো অসীম, অতলান্ত। তাই সাগরে গিয়ে যত ময়লাই পড়ুক, সাগরের তাতে কিছু বিপদ নেই, সাগর ঠিকই নির্মল থাকবে।

কিন্তু, সত্যিই কি তাই ? সত্যিই কি সাগর অসীম অতলান্ত ? সেজন্য দেখাই যাক না সাগরের চেহারা কেমন ?

বোঝবার, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধের জন্য সাগরের জলস্তরকে নানান অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। একে বলা হয়েছে জোনিং। মূলতঃ দু'ভাগে এই জলস্তরকে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, অগভীর ও সুগভীর সমুদ্রের অঞ্চল।

(১) অগভীর সমুদ্রাঞ্চল বা নেরিটিক জোন—শহর প্রান্তে, যেখানে সমুদ্র শুরু হয়েছে, সেই জলস্তরকে বলে নেরিটিক জোন বা অগভীর সমুদ্রাঞ্চল। এই জলস্তরে সূর্যালোক প্রচুরভাবে আসে। সেজন্যই এখানে উৎপাদক উদ্ভিদ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ব্যবহারী জলজ প্রাণী প্রচুরভাবে জন্মায়।

এই অগভীর সমুদ্রাঞ্চলকে আবার তিন স্তরে ভাগ করা হয়। যেমন—

(ক) জোয়ার-ভাটার অঞ্চল বা ইন্টারটাইডাল জোন বা লিটোরাল জোন :—

এই জলাঞ্চলে দিনে দুবার জোয়ার-ভাটা খেলে। ফলে, দিনে দুইবার এই অঞ্চলের জলস্তর বাতাস ও সূর্যালোকে আসতে পারে। এই অঞ্চলের জলে প্রচুর আলো, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও খনিজ পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। আর সেজন্যই এই জলাঞ্চলে জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণী সহজে বাঁচে ও দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(খ) জোয়ার-ভাটার সীমান্তাঞ্চল বা সাবটাইডাল জোন বা আপার নেরিটিক জোন :—

ভাটার সীমারেখা থেকে আরও ৫০ মিটার (প্রায় ১৫০ ফুট) পর্যন্ত এই জলাঞ্চলের বিস্তার। এখানে উৎপাদক ও ব্যবহারিক, দু ধরনেরই জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে।

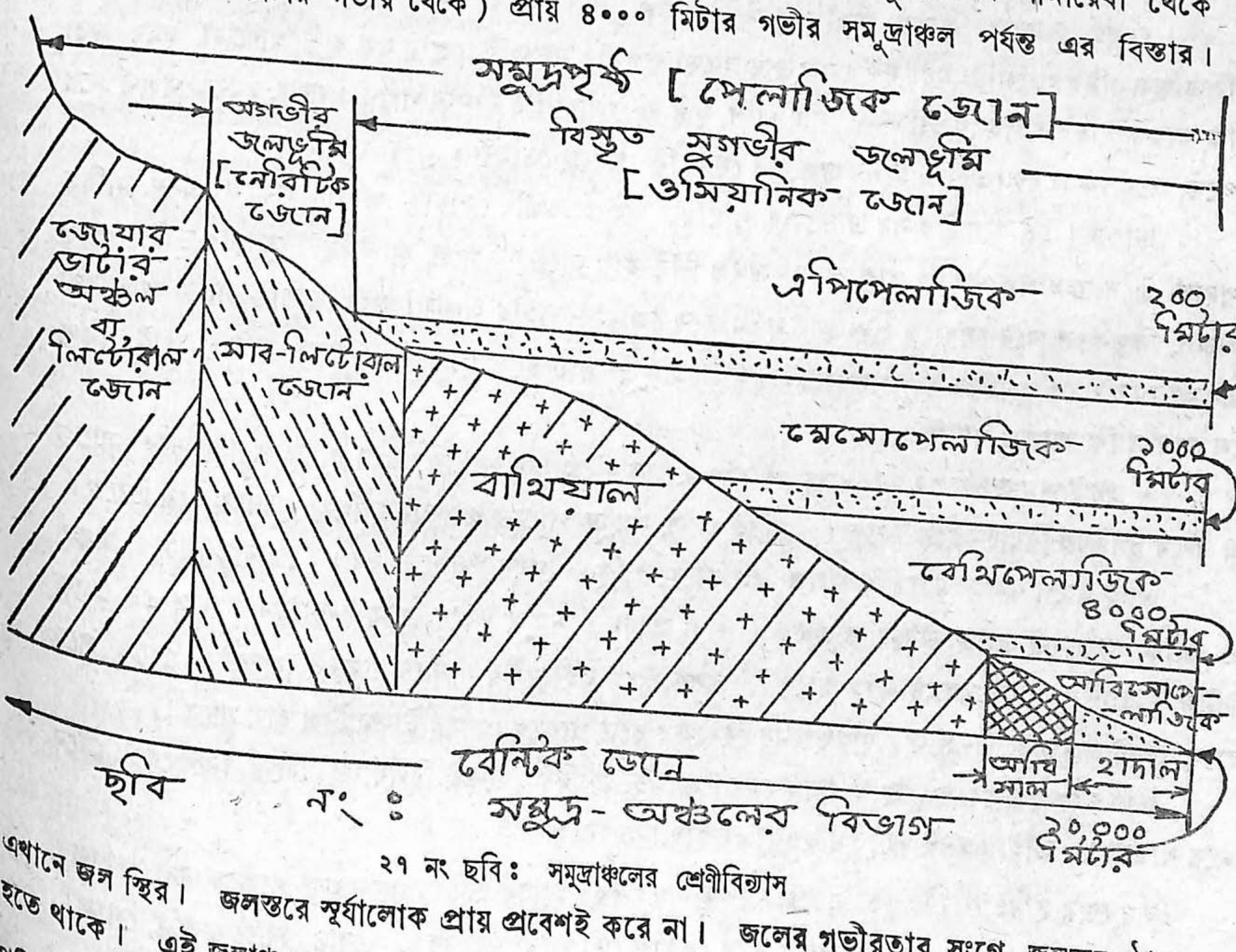
(গ) জোয়ার-ভাটার প্রত্যন্ত অঞ্চল বা লোয়ার নেরিটিক জোন :—

এই অঞ্চল মহাদেশীয় সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। সূর্যালোক এই অঞ্চলে অল্প প্রবেশ করে বলে জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর সংখ্যা এখানে খুবই কম।

জোয়ার ভাটার সীমান্ত অঞ্চল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলকে এককথায় বলে জোয়ার-ভাটার প্রান্ত অঞ্চল বা সাবলিটোরাল জোন। নদী-সমুদ্রের নির্মলতা রক্ষা করার দায়িত্ব এই প্রান্ত সীমাঞ্চলেরই। সমুদ্র দূষণ শুরু হয় এই প্রান্ত সীমাঞ্চলেই বা সাবলিটোরাল জোনে।

(২) সুগভীর সমুদ্রাঞ্চল, বা, ওসিয়ানিক জোন—মহাদেশীয় অঞ্চল, বা কনটিনেন্টল সেলফের পরই যে বিস্তৃত সমুদ্রাঞ্চল তাকেই বলে ওসিয়ানিক জোন, বা, সুগভীর সমুদ্রাঞ্চল। সমুদ্রতলের গভীরতা দিয়ে এই সমুদ্রাঞ্চলকে আবার তিন জলাঞ্চলে ভাগ করা হয়। যেমন,—

(ক) স্বল্প গভীর সমুদ্রাঞ্চল (বাথিয়াল জোন) :—মহাদেশীয় সমুদ্রাঞ্চলের সীমারেখা থেকে (অর্থাৎ প্রায় ২০০ মিটার গভীর থেকে) প্রায় ৪০০০ মিটার গভীর সমুদ্রাঞ্চল পর্যন্ত এর বিস্তার।



২৭ নং ছবিঃ সমুদ্রাঞ্চলের শ্রেণীবিন্যাস

এখানে জল স্থির। জলস্তরে সূর্যালোক প্রায় প্রবেশই করে না। জলের গভীরতার সংগে জলস্তর ঠাণ্ডা হতে থাকে। এই জলাঞ্চলে জলজ-গুল্ম ও জলজ প্রাণী প্রায় থাকেই না।

(খ) মধ্যগভার সমুদ্রাঞ্চল (আবিয়াল জোন) :—৪০০০ মিটার গভীর সমুদ্রাঞ্চল থেকে ৬০০০ মিটার গভীর সমুদ্রাঞ্চল পর্যন্ত এই সমুদ্রাঞ্চলের বিস্তার। এখানের জলস্তর স্থির, ঠাণ্ডা ও স্বল্প অক্সিজেনযুক্ত। খুবই কম জলজ প্রাণী দেখা যায়। সামান্য যেসব জলজ প্রাণী দেখা যায়, তাদের রঙ কালো, চোখ বড় বড়। এই জলস্তরের জলজ প্রাণীদের নিজ শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরণের ক্ষমতা থাকে।

(গ) অতিগভীর সমুদ্রাঞ্চল (হাদলি জোন) :—৬০০০ মিটার গভীর সমুদ্রাঞ্চলের থেকে প্রায় ১০,০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এই সমুদ্রাঞ্চলের বিস্তার।

কিছু বিজ্ঞানীরা আবার সূর্যরশ্মির সমুদ্রস্তরে প্রবেশ্যতা মান দিয়ে সমুদ্রাঞ্চলকে ভাগ করেছেন। যেমন,—

(১) আলোকোজ্জ্বল স্তর (ইউফেটিক জোন) :—সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অঞ্চল এই জলস্তরে পড়ে।

(২) আলোকহীন স্তর (ফোটিক জোন) :—২০০ মিটার জলতলের নীচের সমুদ্রাঞ্চলকে বলে আলোকহীন স্তর। মধ্যম গভীর ও অতিগভীর সমুদ্রাঞ্চল এর আওতায় পড়ে।

দেখছ তাহলে, সমুদ্র অসীমও নয় অনন্তও নয়। তবে সমুদ্র যে বিশাল, সুগভীর এটা ঠিক। কিন্তু স্থলভূমির লাগোয়া মহাদেশীয় সমুদ্রাঞ্চল তো সুগভীর নয় তাই এস্তরে যত খুশী আবর্জনা, দূষণ করা কি যায়? এই জলস্তরে প্রতিদিন যদি পলি, বৃষ্টি ও নদীবাহিত নানান পদার্থ, মলমূত্র, দূষণক পদার্থ এসে পড়ে, তবে কি অবস্থা হবে এই সমুদ্রতলের সেটা কি ভেবেছ তোমরা?

তাছাড়া এই অগভীর সমুদ্রাঞ্চলের প্রাথমিক অঞ্চলে অর্থাৎ জোয়ার ভাটার অঞ্চলে এসব বাহিত পদার্থ এসে ক্রমাগত পড়তে থাকলে সমুদ্রতল ভর্তি হয়ে যাবে। ফলে, আজ যেটা জোয়ার-ভাটার প্রান্ত অঞ্চল, কিছুকাল পরে সেখানে শুরু হবে নূতন করে জোয়ার-ভাটার অঞ্চল। আর জোয়ার-ভাটার প্রান্তরেখা ক্রমেই সরে যাবে সুগভীর সমুদ্রাঞ্চলের দিকে। সমুদ্র ছোট হতে থাকবে। আজ হচ্ছেও তাই, কিন্তু সে খেয়াল কি আমরা রাখছি?

এ জন্যই সমুদ্রাঞ্চলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জোয়ার-ভাটার অঞ্চল দূষিত পদার্থে ভরে যাচ্ছে ও ক্রমে দুর্গন্ধময় বিষাক্ত হয়ে উঠছে। তারই ফলে, সমুদ্র পাড়ের স্থলভূমি দুর্গন্ধময় দূষণময় হয়ে উঠছে।

এরই সংগে জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণিজগতে কি বিপর্যয় আসছে দেখ। জোয়ার-ভাটার অঞ্চল ও প্রান্ত অঞ্চলেই জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীরা জন্মায়। সমুদ্র দূষণে জোয়ার-ভাটার অঞ্চলে এই জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা ক্রমেই কমে যাবে। এরই সংগে মহাদেশীয় সীমারেখা যতই স্থলভূমি থেকে সরে যাবে, ততই জলজ প্রাণী-গুল্মের বাসস্থানের হেরফের হতে থাকবে। সব টালমাটাল হয়ে যাবে।

তাই যথেচ্ছভাবে সমুদ্রে যা কিছু ফেলা মানেই, সবদিক থেকেই বিপর্যয়ের দিকে নিজেদের টেনে নিয়ে যাওয়া। তাই এখনই সচেতন হওয়া দরকার, নয় কি?

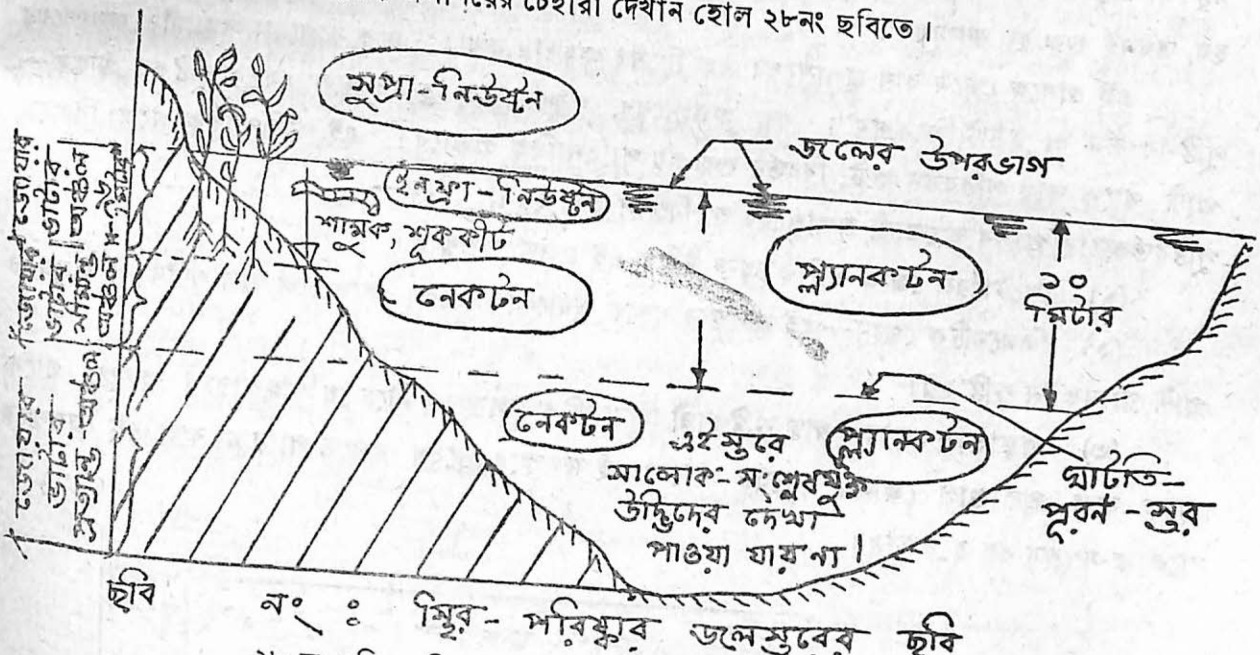
সমুদ্রের ছবিটাতো কিছুটা বুঝলে। কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার সংগে যুক্ত থাকছে নদী, জলাশয়, হ্রদ। সেখানে প্রকৃতি কি কাজ কারবার করে সেটাও তো জানা দরকার। এবার সেটাই বলছি, শোন।

জলাশয়ের কাজ-কারবার

জোয়ার-ভাটার সংগে সংযুক্ত নদীতে বা স্থির জলাশয় বা হ্রদে কি ধরনের কাজ কারবার চলে সে খবর না রাখলে জল দূষণের ছবিটা পরিষ্কার হবে না।

বিজ্ঞানীদের ভাষায় ছোট পুকুর বা বদ্ধ জলাশয়কে বা হ্রদকে বলে লেন্টিক জল বা স্থির জলাশয়। আর প্রবাহমান নদীর জলকে বলে প্রবাহিত জলাশয় বা লেটিক-জল।

স্থির-জলাশয় বা লেন্টিক-জলাশয়ের চেহারা দেখান হোল ২৮নং ছবিতে।



২৮ নং ছবি : স্থির জলাশয়েব (লেন্টিক ওয়াটার) স্তর বিন্যাস

ছবিটা বুঝতে হলে কতকগুলি শব্দের সংগে পরিচয় দরকার। সেগুলো হচ্ছে,—

সুপ্রা-নিউটন বা ভাসমান ডিম্বমালা—জলচর পাখী, মশার ভাসমান ডিম, এসব যা জলের ওপর ভেসে বেড়ায় তাইই হচ্ছে সুপ্রা-নিউটন বা ভাসমান ডিম্বমালা।

ইনফ্রা-নিউটন বা ডুবন্ত ডিম্বমালা—জলস্তরের ঠিক নীচে যে সব জলজ প্রাণী বা ডিম্বমালা ঘুরে বেড়ায় তাদের বলে ইনফ্রা-নিউটন। শামুক, শূককীট, মশার বাচ্চারা এই গোত্রীয়।

প্ল্যানকটন—ডুবন্ত নিউটনের নীচে যেসব জলজ প্রাণীরা ধীরে ধীরে জলতলে চলাফেরা করে তাদের বলে প্ল্যানকটন। প্রোটোজোয়া, কুচো চিংড়ির বাচ্চারা (লারভি), রোটিফায়ার জাতের মাছ, এরাই হচ্ছে প্ল্যানকটন।

নেকটন—প্ল্যানকটনের পাশাপাশি এই জলজ প্রাণীরা সাঁতরে বেড়ায়। চিংড়ি, একধরনের শামুক, একধরনের মাছ এই গোত্রীয়।

অক্সিজেনের বাড়তি-কমতির ওপরেই এসব প্রাণী ও জলজ উদ্ভিদের বাঁচা নির্ভর করে। অক্সিজেন জলের ওপরভাগে বেশী থাকে আর ধীরে ধীরে যত নীচে নামা যায় তত অক্সিজেন কমতে থাকে। কিন্তু জলের নীচে, একটি জলস্তরে পোঁছে, অক্সিজেন ঘাটতি আবার পূরণ হয়ে যায়। এই জলস্তরকে বলে 'ঘাটতিপূরণ জলস্তর'। এই জলস্তর সাধারণতঃ ১০ মিটার নীচে হয়।

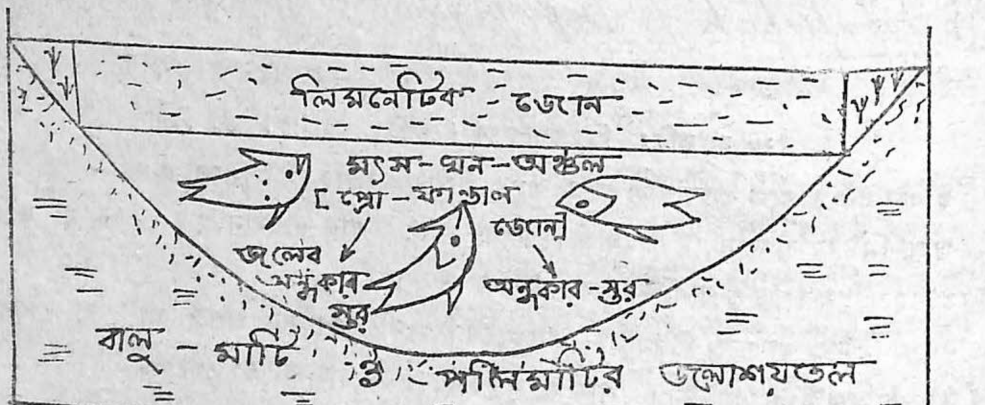
বুঝতে পারছ, সূর্যালোক প্রবেশ্যতার মানের ওপর নির্ভর করে, অক্সিজেনের কম-বেশীর ওপর নির্ভর করে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী বাঁচে। তাই জলস্তরে, কোনও কারণে দূষণের জন্য যদি সেই অক্সিজেনে ঘাটতি হয় বা অন্যান্য জৈব বা অজৈব পদার্থ বেশীমাত্রায় জলে এসে পড়ায় জলস্তরের শ্রেণীবিন্যাসে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তখনই শুরু হয় জলদূষণ।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখ জলাশয়ের এক বিশেষ ক্ষমতার কথা। একে বলেছেন বিজ্ঞানীরা জলাশয়ের পুষ্টি-বিবর্তন' বা 'ইউট্রিফিকেশন'। বদ্ধ জলাশয়ের, পুকুরের বা হ্রদের জলে যেসব পুষ্টিকর উদ্ভিদ—প্রাণী থাকে তার পরিবর্তন ঘটে, বিবর্তন শুরু হয় পারিপার্শ্বিক প্রভাবে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচারে, পুষ্টিবর্তকতার প্রভাব অনুযায়ী জলাশয়ের স্তরবিন্যাস করা হয়। যেমন—

(১) লিটোরেল জোন—শিকড়যুক্ত উদ্ভিদ এই জলস্তরে জন্মায়।

(২) লিমনেটিক জোন—এই জলস্তরে সহজে সূর্যালোক প্রবেশ করে বলে খাদ্য সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যানকটন সৃষ্টি হয়।

(৩) প্রফাণ্ডাল জোন—খাদ্য সৃষ্টিকারী লিমনেটিক জলস্তরের নীচে যে অন্ধকারময় জলস্তর থাকে তাকে বলে প্রফাণ্ডাল জোন। সূর্যের আলো এই জলস্তরে প্রবেশ করতে পারে না বলে এই জলস্তরে সালোক-সংশ্লেষ বন্ধ হয়ে যায়।

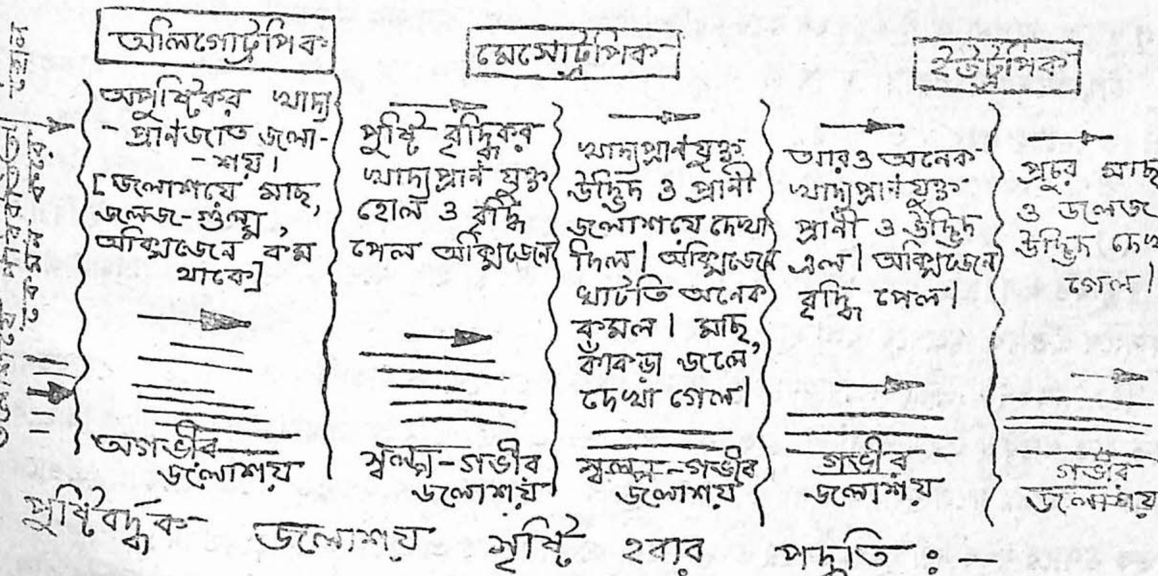


ছবি নং : পুষ্টিবর্তক জলাশয় [ইউট্রফিক লেক]

২৯নং ছবি: পুষ্টিবর্তক জলাশয়ের (ইউট্রফিকলেক) নানান্ স্তর

এবার বোঝাচ্ছি অগভীর জলাশয় (অলিগোট্রপিক লেক) থেকে পুষ্টিবর্তক সুগভীর জলাশয় (ইউট্রপিক লেক) কেমন করে হয়। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সারা বছর জুড়েই

সা লোক-সংশ্লেষণ কাজ চলে। ফলে সারা বছরেই প্রচুর জলজ গুল্ম জন্মিয়ে পুষ্টিবর্তক জলাশয়ের ভারসাম্য রক্ষা হয়। এই ভারসাম্য রক্ষা যে সঠিক হচ্ছে সেটা বোঝা যায় যখন এই জলাশয়ে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও জলজ গুল্ম প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জলাশয়ের পুষ্টি যদি আবার মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায় তখন জলজ গুল্ম অত্যধিক বেড়ে যাবে জলে। তারপর জলজ গুল্ম পচতে শুরু করবে। বাতাস যেমন এর জন্য দূষিত হবে, তেমনি জলের মধ্যে অক্সিজেন খরচের হারও প্রচুরভাবে বেড়ে যাবে। এই বর্ধিত হারের অক্সিজেন প্রয়োজন জলাশয়ের জলশোধনের জন্য। বাড়তি অক্সিজেন জল নির্মলতার কাজে খরচা হওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজপ্রাণীর সংখ্যা জলাশয়ে কমে যাবে। সংগে সংগে বর্ধিত হারে সৃষ্ট জলজ গুল্ম পচনের পর, দ্রুতহারে গভীর জলাশয়ের তলে জমা হবে। শেষে গভীর জলাশয় (ইউট্রপিক লেক) বুজে গিয়ে বদ্ধ জলাশয়ে রূপান্তরিত হবে। অগভীর থেকে গভীর জলাশয় কেমন করে হয় ব্যাপারটা নীচে বোঝান হোল ৩০ নং ছবিতে।



৩০ নং ছবি: অগভীর থেকে গভীর জলাশয়ে কার্যধারা

জলাশয়ের ব্যাপারটা বোঝার সাথে সাথেই একটু জেনে রাখ, নদীতে দূষিত জল পড়ার পর নদী তাকে কি আপনা থেকেই শোধন করতে পারে? যদি নাই পারত, তবে এতদিন নদী আমাদের বাঁচিয়ে রাখল কেমন করে? আর আজই বা নদী শোধন-ক্ষমতা হারাল কি করে?

নদীর স্বাভাবিক শোধন ক্ষমতা কি ?

নদীতে কিছু ফেলা মানেই নোংরার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া নয়। বরং প্রতিদিন নদী-নালা, কল-কারখানা দিয়ে যে অপরিশ্রুত জল নদীতে পড়ছে, পড়ার সময় সেই অপরিশ্রুত জল জৈব অজৈব পদার্থ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস, কার্বন উপাদান এরই ফলে প্রচুরভাবে নদীতে এসে পড়ছে। ফলে নদী দ্রুত দূষিত হচ্ছে। এসব উপসর্গের জন্য নদী তার স্বাভাবিক শোধন ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলছে।

কথাটা শুনে প্রশ্ন করবে হয়ত, নদীর স্বাভাবিক শোধন ক্ষমতা, এ আবার কি ? নদীতে দূষিত পদার্থ পড়লে তাকে আপনা আপনি কেমন করে নদী পরিশুদ্ধ করবে ? ম্যাজিক নাকি ?

হ্যাঁ, অনেকটা প্রকৃতি দেবীর বা পরিবেশের নিজস্ব ম্যাজিক বলতে পার। নদীর এই যাদুকরী ক্ষমতা কি সেটাই শুনে নাও এবার।

কোন পদ্ধতিতে নদী স্বাভাবিক পরিশোধনের কাজ করে দেখ।

(১) তরলিতকরণ —দূষিত জল প্রথমেই এসে পড়ে নদীবুকের বিরাট জলভাণ্ডারে। এই বিরাট জলস্তরে দূষিত জল মিশ্রিত হওয়ার সংগে সংগে দূষণের পরিমাণ বা হার অনেকটা কমে যায়। বিরাট জল-স্তরের সংগে এভাবে মিশ্রণকে বলা হয় তরলিতকরণ বা ডাইলিউশন।

(২) থিতনক ক্রিয়া—প্রবাহমান দূষিত জলধারার সংগে সূক্ষ্ম ও মাঝারি দানার বিভিন্ন পদার্থকণা প্রবাহিত হতে থাকে। ক্রমে সূক্ষ্ম ও মাঝারি পদার্থকণা একত্রিত হয়ে প্রবাহমান নদীর তলদেশে থিতিয়ে পড়ে যায়। তারই ফলে নদীবক্ষ এসব ভাসমান দূষণক পদার্থকণা থেকে মুক্ত হতে থাকে। এভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে যখন নদী দূষণমুক্ত হয় তখন তাকে বলে থিতনক প্রক্রিয়া বা সেডিমেন্টশন।

(৩) অক্সিজেন জারন প্রক্রিয়া—যেটুকু অক্সিজেন জলের মধ্যে মিশে থাকে তার বিশেষ কাজ আছে। এই জলমিশ্রিত অক্সিজেন জরুরি জারনকারী অকসিডাইজিং পদার্থ। অক্সিজেনের সংযোজনে জলের মধ্যে মিশে থাকা দূষিত কণা রাসায়নিক জারন প্রক্রিয়ায় জমাট বাঁধে। আর তারপর বৃহদাকার পদার্থ-কণায় পরিণত হয়ে নদীর তলদেশে থিতিয়ে পড়ে যায়।

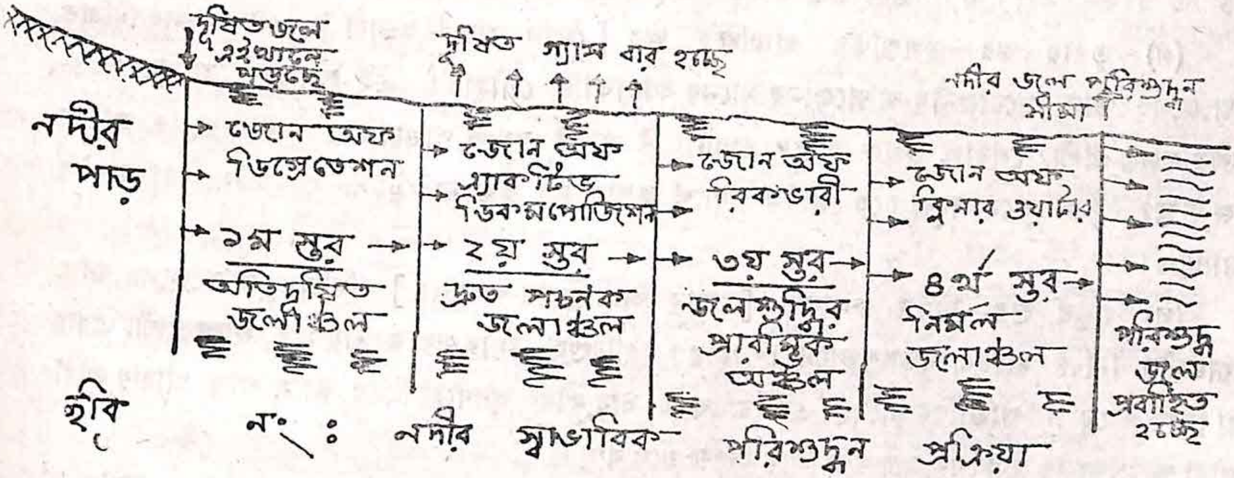
এরই সংগে যেসব বীজাণুকণা অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই মরে যায় অর্থাৎ যারা অবায়ুজীবী, তারা অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে জারন প্রক্রিয়ার ফলে মরে গিয়ে নদীতলে পড়ে যায়। অবায়ুজীবী বীজাণু অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া যারা বাঁচে [অ্যান অ্যারোবিক ব্যাকট্রিয়া] এভাবে জলস্তরে বিবর্তনের মাধ্যমে, জলের মধ্যের অনেকটাই অক্সিজেন খরচা করে ফেলে।

(৪) অজারণ ক্রিয়া—জারন প্রক্রিয়ার পরে শুরু হয় অজারন ক্রিয়া [রিডাকশান]। এই স্তরে অক্সিজেন কমে যাওয়ায় অক্সিজেন ছাড়া যেসব জীবাণু বাঁচতে পারে না, অর্থাৎ বায়ুজীবীরা [অ্যারোবিক

ব্যাকাট্রিয়া] অক্সিজেনের ঘাটতির জন্য মরে যায় ও নদীতলে পড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে।

(৫) সূর্যরশ্মির প্রভাব—জারন ও অজারন ক্রিয়ায় যেমন অবায়ুজীবী ও বায়ুজীবী জীবাণুরাও মরে যায়, তেমনি বাড়তি অক্সিজেন ও কমতি অক্সিজেনের জন্য জারন ও অজারন প্রক্রিয়াতেও দূষিত জলের বিবর্তন ঘটে। এরই ফলে জল অনেকটা পরিশুদ্ধ হলেও নানান সূক্ষ্ম জীবাণু জলে থেকেই যায়। সূর্যরশ্মির লাল উজানি আলো [আলট্রা ভায়ালেট রে] জলের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেই জীবাণুদের ধ্বংস করে দেয়। এভাবেই পাঁচটি প্রক্রিয়ায় দূষিত জল স্বাভাবিকভাবেই নির্মল হয়ে উঠে।

চলমান নদী কেমন করে তার বহতার সংগে দূষিত জলকে ধাপে ধাপে শোধন করে, ৩১নং ছবিতে দেখ। চার স্তরে নদীর এই বহতাকে ভাগ করা হয়ঃ



৩১ নং ছবিঃ নদীর স্বাভাবিক পরিশুদ্ধন প্রক্রিয়া

প্রথম স্তরে থেকে ৪র্থ স্তরের কাজ করার সময় নদী তার পরিশোধনের পাঁচটি গুণাবলীকে কাজে লাগাচ্ছে কেমন করে সেটাই দেখ।

(ক) প্রথম স্তর—অতি দূষিত জলাঞ্চল (জোন অফ ডিগ্রোডেশন) :—দূষিতজল প্রথমে যখন নদীতে এসে পড়ে তখন নদীর জলের সংগে তরলিত হয়ে কিছুদূর প্রবাহিত হয়। এই জলাঞ্চলে এই মিশ্রণের ফলে অক্সিজেনের ভাগ শতকরা ৪০ ভাগ কমে যায়। শেষে একদম অক্সিজেনহীন হয়ে যায়।

এই জলস্তরের মধ্যে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করতে পারে না ও শৈবাল, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ থাকেই না। ভাসমান দূষিত পদার্থ এই জলস্তরেই নদীবক্ষে পড়তে শুরু করে। এই জলস্তরে নানান্ ধরনের কীট জন্মায়, যার ফলে, প্রথম স্তরের জল পানের অযোগ্য থাকে। এই স্তরে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি পায়।

(খ) দ্বিতীয় স্তর—দ্রুতপচনক জলাঞ্চল [জোন অফ এ্যাকটিভ ডিকমপোজশন] :—

এই স্তরের নদী অঞ্চলে প্রথমে অক্সিজেনহীন হলেও ধীরে ধীরে নদীর বহতার সংগে অক্সিজেন-

মান প্রয়োজনীয় মানের ৪৩ শতাংশে পৌছায়। প্রয়োজনীয় অক্সিজেনমান না থাকায় এই জলস্তরের মৎস্যজাতীয় প্রাণী প্রায় থাকেই না। ১ম স্তরের জলের রঙের চেয়েও এই স্তরের জলের রঙ কালচে অনেকটা ধূসর ধরনের মতো। দূষিত বাষ্প যেমন মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি এই দ্বিতীয় জলস্তর থেকেই উদ্ভূত হয়। এই গ্যাস যখন জলের নীচ থেকে নদী পৃষ্ঠে আসে তখন বুদ্বুদের সৃষ্টি হয় ও অবায়ুজীবী জীবাণুদের পতন শুরু হয়। আর তারই ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, এ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন নির্গত হয়। এই দ্বিতীয় স্তরে অক্সিজেনের ঘাটতি থাকে বলে বায়ুজীবী জীবাণুরা মারা যায় আর সেই শূন্য জায়গায় অবায়ুজীবী জীবাণুরা দখল করে ফেলে। এমনি করে সমস্ত বায়ুজীবীদের জায়গা দখল করে ফেলে অবায়ুজীবীরা। যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় অক্সিজেন মান [অক্সিজেন ডিম্যাণ্ড] সুষ্ঠ অক্সিজেনের পরিমাণ থেকে কমে না যায় ততক্ষণ এই প্রক্রিয়ায় অবায়ুজীবীরা বাড়তেই থাকে। মলজাত কীট এই স্তরেও দেখা যায়। তবে গুল্ম ও জলজপ্রাণীও সামান্য কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

(গ) তৃতীয় স্তর—জলশুদ্ধির প্রারম্ভিক স্তর [জোন অফ রিকভারী]—এই অঞ্চলের মিশ্রিত অক্সিজেনের ভাগ প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মানের কাছাকাছি পৌছায়। এই জলাঞ্চলে আবার মৎস্যজাতীয় জলজ-প্রাণী, শৈবাল, জলজ উদ্ভিদ মোটামুটি ভালই দেখতে পাওয়া যায়। তবে ছত্রাক জাতীয় জলজ উদ্ভিদ এই জলস্তরে অদৃশ্য হয়ে জৈবিক পদার্থে রূপান্তরিত হয় নাইট্রেটস, ফসফেটস, কারবনেটস ইত্যাদিতে।

(ঘ) চতুর্থ স্তর—নির্মল জলাঞ্চল [জোন অফ ক্লিয়ার ওয়াটার]—মিশ্রিত অক্সিজেনের ভাগ, প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট মানের, শতাংশভাগে পৌছায়। পরিশুদ্ধ নদীর সব জাতীয় মাছ, জলজপ্রাণী, এবার দেখা দিতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এই জলস্তরে বায়ুজীবী প্রাণীরা ফিরে আসে আর আবায়ুজীবী প্রাণীরা অক্সিজেনের প্রাচুর্যের জন্য মরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এভাবেই নদীতে প্রবাহিত হবার সময় চারটি স্তর পার হয় আর দূষিত জল ও পদার্থ যা নদীবুকে এসে পড়ে তার থেকে নদীকে পরিশুদ্ধ করে দেয়।

নদীর স্বাভাবিক পরিশোধন ক্ষমতা থাকলেও যতখুশী দূষিত পদার্থ যে কোনও নদীস্তরে ফেলা যায় না। কেন জান? স্বাভাবিক উপায়ে নদীকে যদি নির্মল জলাধারে রাখতেই চাও তবে কি কি দরকার জেনে রাখ। তা হচ্ছে—

(১) নদীকে বেশ কিছুটা প্রবাহিত হোতে দিতে হবে। এই প্রবাহন পরিধিতে দূষণক নূতন পদার্থ বা দূষিত জল ফেলা যাবে না। কারণ তখন নদীর চারস্তরের কাজকর্মের উলট-পালট হয়ে যাবে।

(২) যে যে কারণে জলস্তরে অক্সিজেন সৃষ্টি হয় তার ব্যবস্থাদি জোরদার করতে হবে। যেমন—

(ক) সালোক সংশ্লেষের সাহায্যে পত্রহরিৎ সবুজ গাছ অক্সিজেন যোগান দেয়। স্থির জলে জলজ গুল্ম বেশী জন্মায় অর্থাৎ সেখানে অক্সিজেনও বেশী উৎপন্ন হয়।

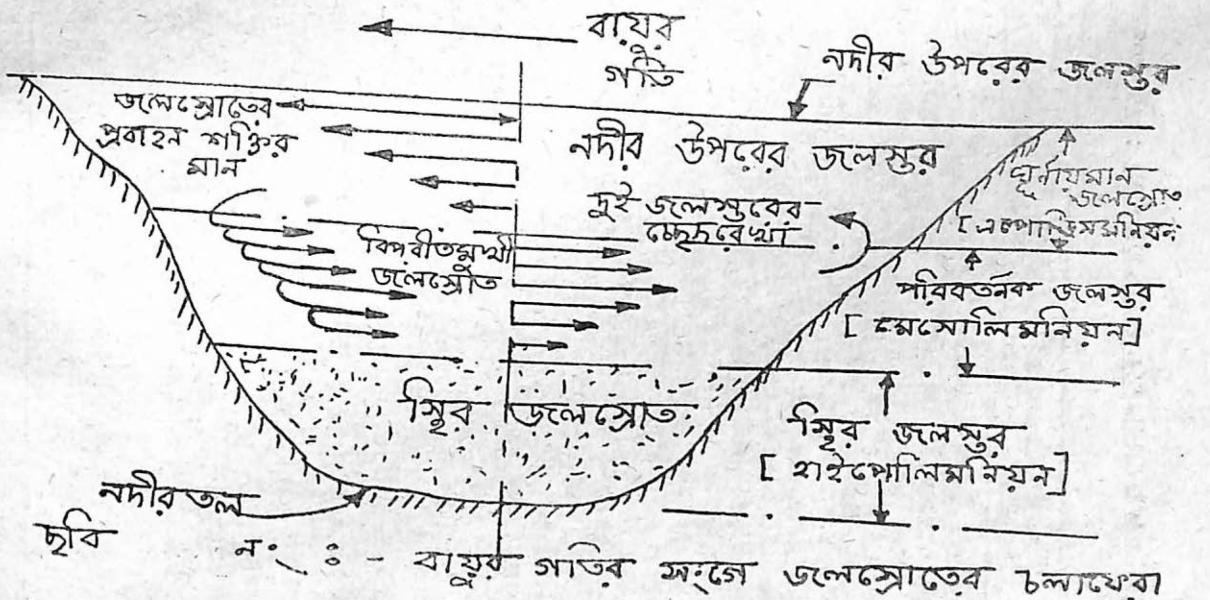
(খ) দিনের সূর্যতাপের হার অক্সিজেন সৃষ্টির সহায়ক। সেজন্যই গ্রীষ্মকালে নদীতে অক্সিজেন সৃষ্টি হয় বেশী।

(৩) নদীতলে জমা তলানিকে পরিবহনের ব্যবস্থা করে বা জমা তলানি যাতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।

(৪) নদীবক্ষে গুল্ম শৈবাল যাতে অত্যধিক না জন্মায় সেদিকে খেয়াল রাখা। কারণ মাত্রারিক্ত জলজ উদ্ভিদ জন্মালে বেশী মাত্রায় পচবে ও বেশী তলানি জলে জমবে। ফলে দুর্গন্ধ ও অক্সিজেন ঘাটতি হবে বেশী। ফলেই মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মরতে থাকবে। বেশীমাত্রায় গুল্ম জন্মালে জল ঘোলাটে, আঁশটে গন্ধযুক্ত বা গেঁজলা ফেনাযুক্ত হবে, নোংরা ঘেসো গন্ধযুক্ত অথবা তেলতেলে বর্ণের হবে।

এই প্রসংগে এটুকুও জেনে রাখ জল দূষিত হলে জলজ প্রাণী বিশেষ করে মাছের অস্তিত্বই পাওয়া মুস্কিল হবে। জলজ উদ্ভিদ বেশী জন্মালে তার পচনে, জলের দূষণই বাড়বে।

জলের দূষণ দূর হওয়ার ক্ষেত্রে বা তাদের গতির বিশেষ ভূমিকা আছে সেটাই দেখান হোল ৩২নং ছবিতে।

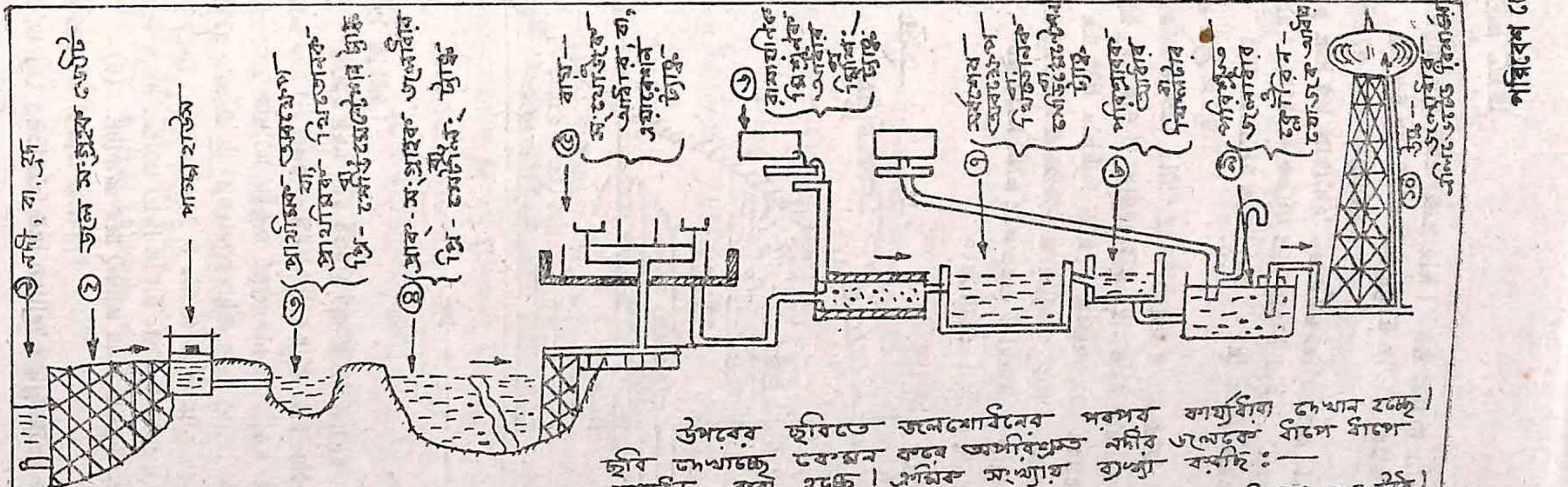


৩২নং ছবি : বাতাসের গতির সঙ্গে জলস্রোতের চলাফেরা

এই সংগে দেখে নাও নদীর মোহনায় বা খাঁড়ির মুখে অর্থাৎ সমুদ্র খাঁড়ি আর মহাদেশীয় প্রান্ত জুড়ে বাতাস কিভাবে জলস্তরকে অন্দোলিত করে। আর তারই ফলে জলজ-প্রাণী মাছরা কেমন করে চলাফেরা করে বড় হয়ে বংশবৃদ্ধি করে। জলদূষণ হলে মহাদেশীয় প্রান্তরেখা সরে গেলে, এই জলজ প্রাণীর চলা-ফেরায় বিঘ্ন ঘটে। মাছরা তাই হঠাৎ দূরে সরে যায়। এজন্যই আগে নদীতে যেখানে মাছ পাওয়া যেত আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না। নদীকে দূষিত করে, সমুদ্র ভরাট করে, আমরাই মাছেদের আবাসস্থলে বিপদ সৃষ্টি করছি।

জল আমাদের জীবন দেয়। নদী সমুদ্র জলভাণ্ডারকে রক্ষা করে। তার দূষণ মানেই জীবের বিপর্যয়। বারবার কথাটা মনে রাখতে হবে। সেকথা ভুলেই আমরা বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়ালাম। তখনই মনে হল আমাদের, জল দূষণ রোধের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ঐ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হোল পরে বলব তোমাদের।

বড় বড় নদী থেকে জল উঠিয়ে তাকে পরিশুদ্ধ করে কেমন করে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয় শুধু সেটুকু ছবি এখন জেনে রাখ। বড় হলে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানবে। ৩৩ নং ছবি দেখ।



উপরের ছবিতে জলশোধনের পরপর কার্যধারা দেখান হচ্ছে। ছবি দেখাচ্ছে কেমন করে অপরিশ্রুত নদীর জলকে ধাপে ধাপে শোধিত করা হচ্ছে। ক্রমিক সংখ্যায় ব্যাখ্যা করছি :—

১ নদী, বা, হ্রদ :— এখানেই অপরিশ্রুত জলে সঞ্চিত আছে॥

২ জল-সংগ্রহক জেটি :— জলের মধ্যে লোহার কাঠামো, যার উপরে নদী থেকে অপরিশ্রুত জল উঠে।

* ৩ প্রাথমিক থিতানক :— অভিকর্ষ বড় ও বেশী ভারী ভাসমান পদার্থকে থিতানো হয়।

* ৪ প্রাক-সংগ্রহক জলাধার :— বড় ও ভারী দানার ভাসমান পদার্থ সরে যাবার পর সঞ্চিত অপরিশ্রুত জলে।

৫ বায়ু-সংযোজক আধার :— কৃত্রিম উপায়ে জলে অক্সিজেন সংযোজিত হয়।

৬ রাসায়নিক মিশ্রন আধার :— ফটকিরী জাতীয় রাসায়নিক পদার্থকে জলে মিশিয়ে সূক্ষ্ম পদার্থকে বড় করা।

৭ সর্বশেষ থিতানক :— কৃত্রিম উপায়ে বড় করা ভাসমান দানাকে কৃত্রিম উপায়ে আরও বড় করে থিতিয়ে যেতে। এইভাবে সমস্ত ভাসমান পদার্থকে নীচে থিতিয়ে ফেলা হোল।

৮ পরিস্রাবক কক্ষ :— এখানে যাবতীয় রাসায়নিক ও জৈবিক পদার্থ, যা, থিতানক কক্ষে পৃথক করা যায় নি, তাকেই সরিয়ে ফেলা হোল।

৯ পরিশ্রুত জলাধার :— পরিস্রাবক আধার থেকে এই আধারে এনে ক্লোরিন সংযোগে বীজাণুমুক্ত করা হোল।

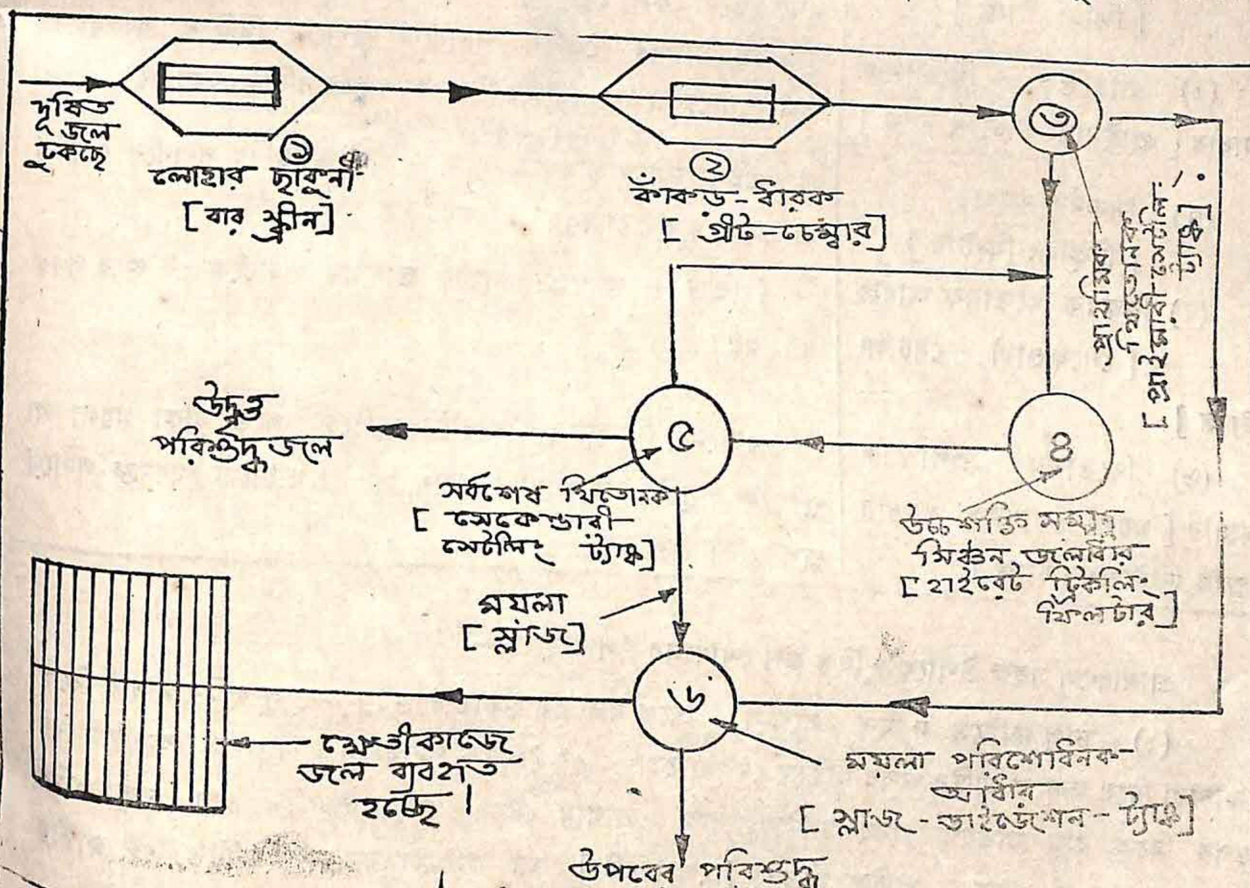
১০ উচ্চ-জলাধার :— পাম্প করে জলে উঁচু জলাধারে তোলা হোল, যাতে এইখান থেকে যখন জলে-সরবরাহ হবে তখন যথাযথ জলের চাপে দূরের ব্যবহারীরা পাবে।

ছবি নং : নদী থেকে সংগ্রহক জলে কেমন করে পরিশ্রুত হয়ে জনবসতিতে পাঠান হচ্ছে সেটাই বোঝান হোল।

৩৩নং ছবি : নদীর জল পরিশুদ্ধ করে পানীয় জলে রূপান্তরণ পদ্ধতি

ত্যক্ত জল শোধন হয় কি করে ?

এরই সংগে জেনে রাখ, মলমূত্রবাহী পয়ঃপ্রণালী, ড্রেন ইত্যাদি দিয়ে যেসব দূষিত জল বা কলকারখানার পরিত্যক্ত জল নদীতে পড়ে যখন তাকে দূষিত করছে তখন তো আর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নদী তাকে চট করে শোধন করতে পারছে না। নদীকে সে সময়টাও দিচ্ছি না আমরা। তখন এই দূষিত পরিত্যক্ত জলকে আগে শোধন করে তবে নদীতে ফেলতে হয়। পরিত্যক্ত দূষিত জল মলমূত্রবাহী জলের



৩৪নং ছবি : ত্যক্ত জলশোধন পদ্ধতি

পরিশোধন পন্থাটা জেনে নাও। বড় হলে এব্যাপারেও বিস্তারিত জানবে। ৩৪ নং ছবি দেখ।

পরিশোধনের কোন স্তরে কোন দূষিত পদার্থকে সরিয়ে দেওয়া হল দেখ।

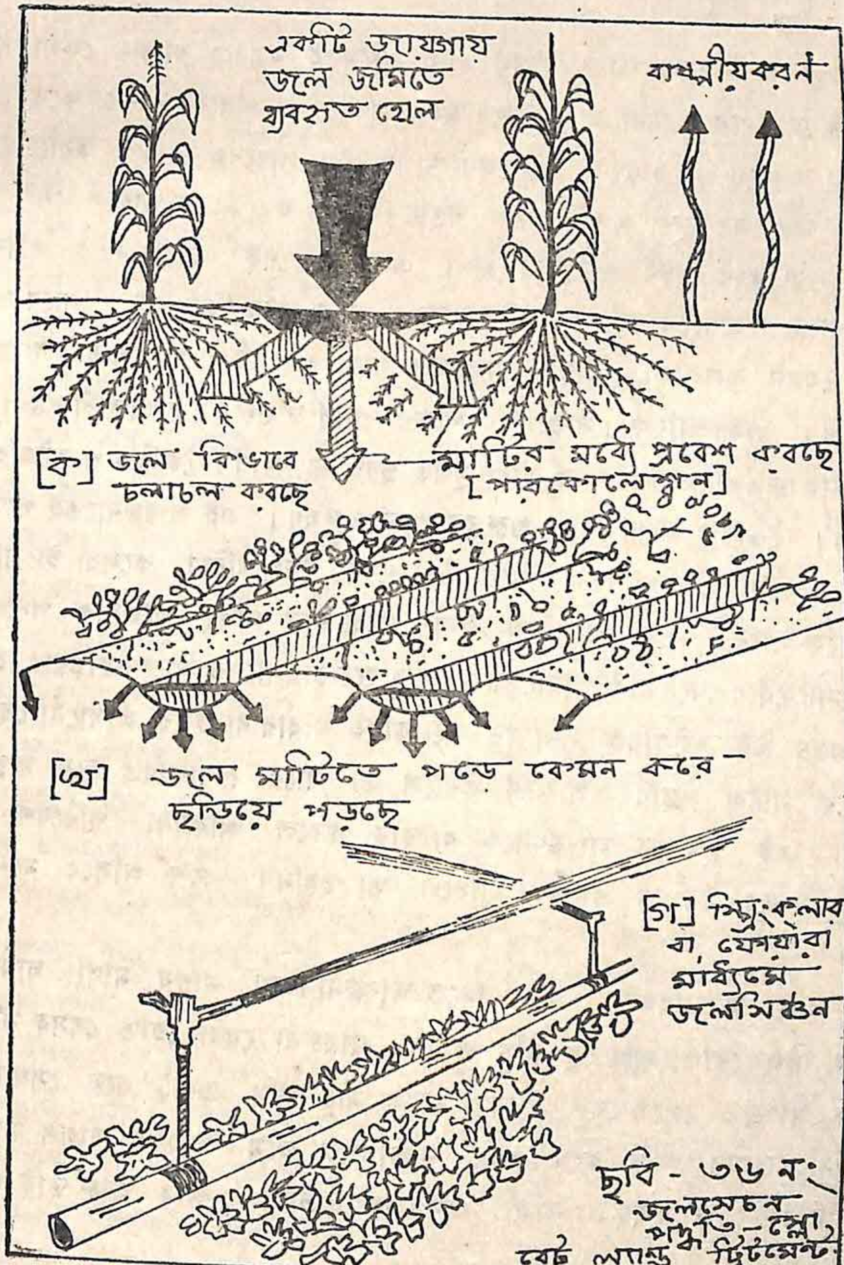
(১) ছাঁকনি [স্ক্রিন]	ভাসমান গাছ, লতাপাতা, ভাসমান মৃত পশু-পাখী ও বড়মাপের ভাসমান শক্ত পদার্থকে এই স্তরে পৃথক করে বার করে দেওয়া হয়।
(২) (ক) কাঁকড় ধারক [গ্রিট চেম্বার]	ভারী ধরনের পতনশীল অজৈবিক দূষিত পদার্থকে এই স্তরে থিতিয়ে নীচে ফেলা হয়। পরে এই থিতনককে সরিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হয়।
(খ) ভাসমান ধারক [স্কিমিং ট্যাঙ্ক]	এখানে তৈলযুক্ত ও চর্বিযুক্ত ভাসমান পদার্থকে ওপর থেকে নীচে ছেঁকে ফেলা হয়।
(৩) প্রারম্ভিক থিতোনক আধার [প্রাইমারী সেটলিং ট্যাঙ্ক]	বড় মাপের জৈবিক পদার্থকে এখানে থিতিয়ে, জালধারের তলদেশে ফেলা হয়। পরে থিতনককে দূরে সরিয়ে ফেলা হয়।
(৪) সিঞ্চনক আধার [ট্রিক্‌লিং ফিল্টার]	এইখানে সরু ভাসমান পদার্থ ও মিশ্রিত জৈবিক পদার্থকে জৈবিক প্রক্রিয়ায় দূর করা হয়।
(৫) দ্বিস্তবক থিতোনক আধার [সেকেণ্ডারী সেটলিং ট্যাঙ্ক]	মিশ্রিত ও কলয়েড জাতীয় ভাসমান পদার্থকে এই স্তরে পৃথক করা হয়।
(৬) থিতোনক রূপান্তরক আধার [ময়লা শোধনক আধার —স্লাজ ডাইজেশন ট্যাঙ্ক]	এখানে থিতোনক আধারের নীচে পড়ে থাকা ময়লা বা স্লাজকে বায়ুহীন বদ্ধ আধারে রেখে, তাপের যাহায্যে দূষণমুক্ত পদার্থে রূপান্তরিত করা হয়।

গ্রামাঞ্চলে সহজ উপায়ে দূষিত জল শোধনের উপায় হচ্ছে—

(১) 'ঢালু জমিতে দূষিত জলক্ষেপ। একে বলা হয় ওভারলোড ফ্লো—ঢালু জমির মাথার দিকে ফোয়ারা দিয়ে জলকে মাটির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই জৈবিক পদার্থযুক্ত দূষিত জল ক্ষেতখামারের ওপর দিকে বয়ে যাওয়ার সময় মাটিকে খাদ্য জোগান দেয়। শেষে প্রবাহিত হয়ে ঢালু জমির প্রান্তে খালে এসে পড়ে। মাটির ছিদ্রতা [পোরসিটি] কম থাকলে বা ঢালু জমিতে, এই জাতীয় ওভারলোড ফ্লো পদ্ধতি চালু করা হয়। ৩৫ নং ছবির (ক) দেখ।

(২) প্রবেশ্য স্তরমাধ্যমে মাটিতে প্রেরণ—সিঞ্চনক প্রবেশন [ইনফিলট্রেশন পারকোলেশন]—এই পদ্ধতিতে দূষিত জলকে অতিরিক্ত চাপে বালু জাতীয় প্রবেশ্য স্তরের নীচে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জল মাটির স্তরের নীচে ছড়িয়ে যায়, আর তখন জলস্তর ধীরে ধীরে নীচ থেকে ওপরে উঠে আসে। একে বিজ্ঞানীরা রিচারজিং সিষ্টেমও বলেন। ৩৫ নং ছবির (খ) দেখ।

(৩) জলসেচন পদ্ধতি [স্লো-রেট-ল্যাণ্ডট্রিটমেণ্ট]—এই পদ্ধতি সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। দূষিত জল দিয়ে ক্ষেতি করা হল। ক্ষেতের সময় জৈবিক প্রক্রিয়ার মাটি দূষিত জলের খাদ্যকণা থেকে সার গ্রহণ করে ক্ষেতের প্রয়োজনীয় খাদ্য জোগায়। মাটিতে জল কিভাবে চলাচল করে, কেমন ভাবে ছড়িয়ে যায় দেখান হোল ৩৫নং ছবিতে।



৩৫ নং ছবি ঃ প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য ভূ-স্তরের দূষিত জল শোধন প্রথা

আবর্জনা থেকে ভূমি দূষণ

শহরাঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য পদার্থের অবশিষ্টাংশ, বাজারের তরি-তরকারীর খোসা ও পচা জিনিসপত্র, রাস্তার ধূলো-বালি ও অন্যান্য পদার্থ যা দুপাশের ড্রেনে এসে পড়ছে, এসবই ,সৃষ্টি করছে আবর্জনা বা রিফিউজ।

এই সমস্ত অবশিষ্টাংশ ত্যক্ত পদার্থ প্রায় খুশীমতই যত্রতত্র রাস্তায় ফেলা হয়। এই ত্যক্ত আবর্জনাকে যদি দ্রুত সরিয়ে ফেলা না হয় তবে আবর্জনা পচে বাতাসকে দূষিত করে তোলে। আবার যদি বা আবর্জনা লরিতে করে দ্রুত জঞ্জালের ভাগাড়ে বা গারবেজ ডামপিং ইয়ার্ডে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলেও সেই জঞ্জালের স্তূপকে যদি সঠিক পন্থায় নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে সেই গারবেজ ডামপিং-এর জায়গায় শুরু হবে পচন ও বাতাসদূষণ। এসব কারণেই আবর্জনাকে সঠিক পন্থায় দ্রুত অপসারণ ও পরে পরিশোধন করা একান্তই দরকার। আজ পর্যন্ত কিন্তু এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শহরগুলোতে যেমন কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতেও সঠিক পরিশোধন ব্যবস্থা করা হয় নি। তবে চেষ্টা চলছে। অথচ আবর্জনা সাজ্ঘাতিক পচনক পদার্থ ও ভয়ংকর দূষণকারী শত্রু।

আবর্জনার দ্রুত পচন শুরু হবার কারণ মূলত দুধরনের পদার্থ। জৈবিক ও অজৈবিক পদার্থ থাকে আবর্জনার মধ্যে। জৈবিক পদার্থ থেকে শুরু হয় পচন ও দূষণ। এই আবর্জনাতেই গড়ে উঠে মশামাছির আস্তানা। আর এসব পোকামাকড় থেকে টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, কলেরা ইত্যাদি ভয়ংকর রোগ দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে। এরই সংগে আবর্জনার মধ্যে জমে থাকা অজৈবিক পদার্থগুলোর পচন না হলেও তারা জমাট বেঁধে বেঁধে এক পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে চারপাশের আলো-হাওয়ার চলাচল পথে বাধা সৃষ্টি করে। অথচ এই অজৈবিক পদার্থের অনেকটাই আবার ব্যবহারে লাগানো যেতে পারে। আর জৈবিক পদার্থকে সঠিক পন্থায় রূপান্তরণ করালে তা সারে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের উপকারেই লাগতে পারে। এই দু'ভাবে আবর্জনাকে ব্যবহার করলে আবর্জনা পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার হাতিয়ারই হয়ে উঠবে। কিন্তু এতদিন আসলে তা হয়নি। প্রশ্ন আসবে মনে তোমাদের, হয় নি কেন ?

প্রশ্নটা আসা স্বাভাবিকই। প্রথম দিকে আবর্জনা নিয়ে মানুষ মাথা ঘামায়নি তার কারণ তখন চারদিকে ছিল খোলামেলা বহু নীচু জমি। আবর্জনা ফেলা হোত সেসব নীচু জমিতে, জমি ভরাটির কাজে আবর্জনা লেগে যেত। কিন্তু ক্রমে নীচু জমি ভরাট হয়ে সেখানে জনবসতি গড়ে উঠল। আবর্জনা ফেলার জমি কমে গেল, রাস্তাঘাটে জমে থাকতে লাগল তারই ফলে। শুরু হোল আবর্জনার পচন ও দূষণ। সমস্যা এসে গেল এভাবে। আর আজ তাই আবর্জনা নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে।

আবর্জনা দূষণ সমস্যা নিয়ে ভাবতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে, আবর্জনা আসে কোথা থেকে ? মূলতঃ তিন জায়গা থেকে আসে আবর্জনা। যেমন, আবর্জনা আসে :—

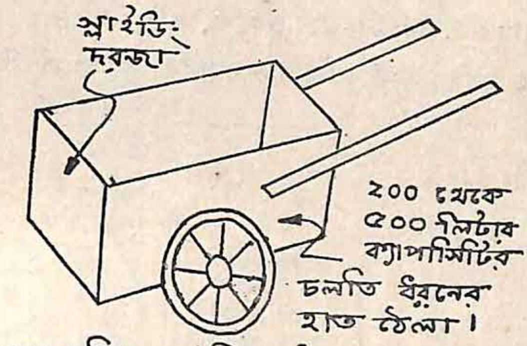
(ক) জনবসতিময় গৃহাঞ্চল থেকে—গৃহাঞ্চলের আবর্জনায় থাকে তরিতরকারীর খোসা, মাছের আঁশ ও নাড়ভূড়ি, গৃহপালিত পশু-পাখীর ত্যক্ত পদার্থ, ছাই, ঘেঁস, পচা জন্তু-জানোয়ার ও জান্তব পদার্থ, বাড়ীঘর ভাঙার রাবিশ ইত্যাদি।

(খ) রাস্তা পথঘাট থেকে—রাস্তাধোয়া ধূলো-বালি, কাদা-পলি, যানবাহনের পরিত্যক্ত পদার্থ, ডাবের খোসা, ভাসমান পাতা, কাগজ ইত্যাদি।

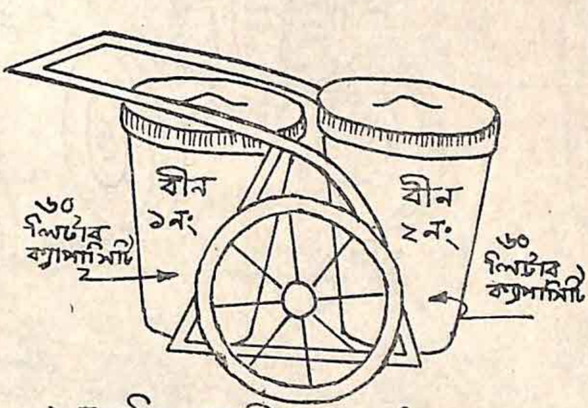
(গ) কলকারখানা ও ব্যবসায়িক অঞ্চল থেকে—এই দুই অঞ্চলের আবর্জনা জৈবিক ও অজৈবিক মিশ্রিত ধরনের। বিপদজনক ত্যক্ত পদার্থ এই অঞ্চলের আবর্জনায় পাওয়া যেতে পারে।

আবর্জনা থেকে শহরকে, পরিবেশকে বাঁচাতে হলে প্রথমেই চাই আবর্জনাকে শহরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংগ্রহ করা। তারপর সংগৃহীত আবর্জনাকে দ্রুত পরিবাহিত করে একস্থানে একত্রিত করা। তারপর একত্রিত আবর্জনাকে যে কোনও উপায়ে রূপান্তরিত করে দূষণমুক্ত করা।

সেজন্যই আবর্জনাকে প্রথমে দরকার শহরের বিভিন্ন স্থানের মূল সংগ্রহস্থলে পরিবহন করা। কি করে পরিবহন হয় ছবিতে দেখ। হাতে টানা ঠেলা বা ট্রাই সাইকেল ঠেলা বা বীনে আবর্জনাকে তোলা হয়। তারপর আনা হয় ভ্যাটে, যেখানে ঠেলায় আনা আবর্জনাকে সংগৃহীত করা হয়। তারপর এই ভ্যাট থেকে আবর্জনাকে ট্রাকে করে দূরে সরিয়ে ফেলা হয়। এই তিন ধরনের পরিবহনের গাড়ীর ছবি ৩৬নং ছবিতে দেখান হোল।



১নং ছবিঃ চলতি ঠেলা



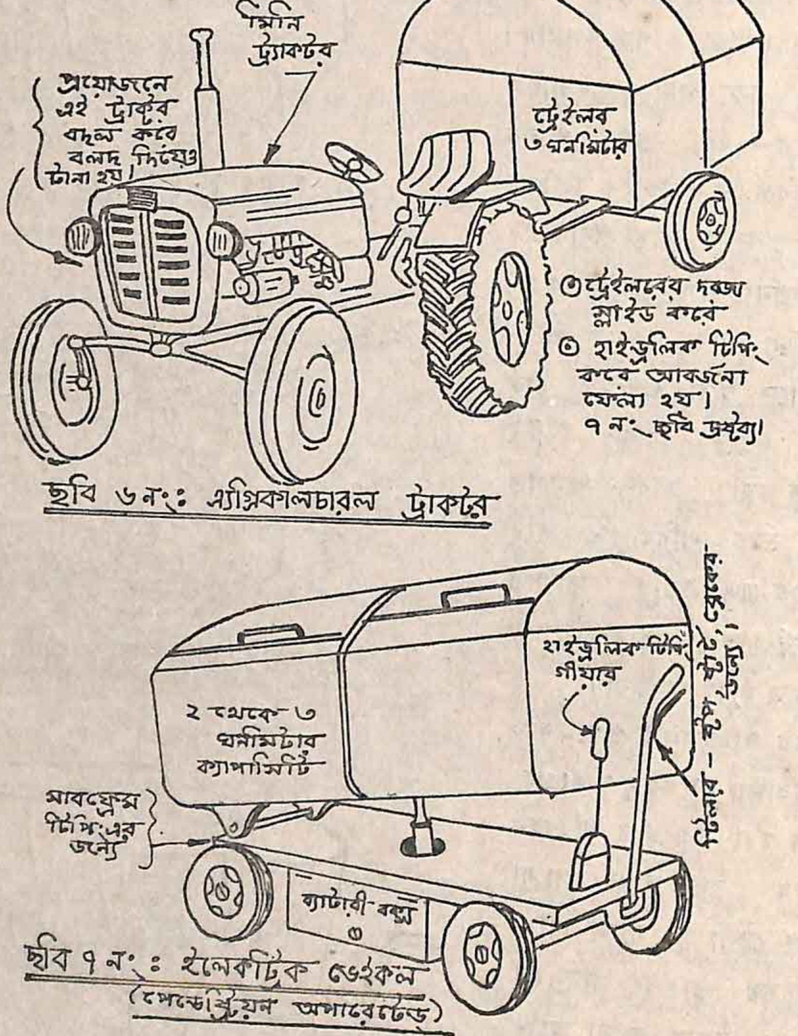
২নং ছবিঃ দু-বীনযুক্ত ঠেলা



৩নং ছবিঃ ছ-বীনযুক্ত ঠেলা

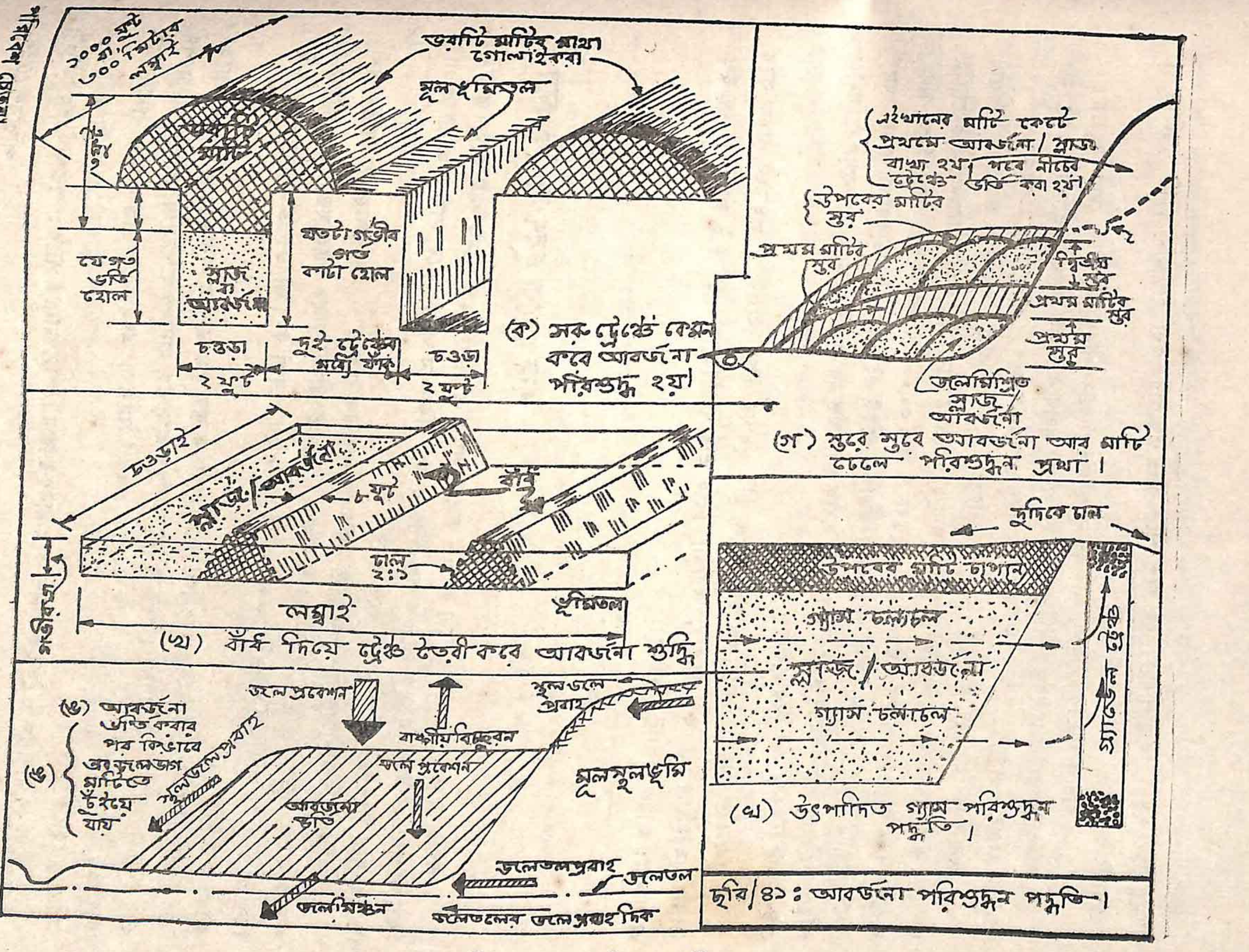
৩৬নং ছবিঃ পরিবহনের জন্য হস্তচালিত গাড়ী

আবর্জনাকে দূরে সরিয়ে ফেলে কি ভাবে পরিশুদ্ধ করা হয় দেখান হোল ৩৮ নং ছবিতে। এখানে আবর্জনাকে নিয়ে এসে প্রথমে বাছাই বা স্ক্রীনিং করা হয় বিরাট যান্ত্রিক ছাকুনি দিয়ে। এই বাছাইএ গ্লাস, ধাতব পদার্থ, চামড়ার টুকরো, কাঠ, কাপড়, কাগজ আলাদা আলাদা করে ফেলা যেতে পারে। তারপর এসব পদার্থকে আবার যথাযথ শিল্পাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে নূল উপাদান [র-মেটিরিয়াল] হিসাবে



৩৭নং ছবি ঃ পরিবহনের জন্য যন্ত্রচালিত বিশিষ্ট গাড়ী

ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ যথাযথ বাছাই করলে আবর্জনা মূল্যহীন নয়। আর বাছাই না করাতেই পরিবেশ দূষিত হোতে শুরু করবে। এই বাছাই-এ এসব পদার্থ, ধূলো, ঘেস আলাদা হয়ে গেলে পরিশোধনযোগ্য আবর্জনা পড়ে থাকে। এই অবশিষ্ট আবর্জনাকে আগ্নেয়চুল্লীতে বা ইনসিনারেটারে



৩৮ নং ছবি ঃ আবর্জনা পরিশুদ্ধন পদ্ধতি

পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু পরিমাণ বেশী হলে তাকে সারে রূপান্তরিত করা হয়, জমি ভরাটি পদ্ধতিতে বা কমপোষ্টিং প্রথায়।

৩৭ নং ছবিতে পরিবহন ব্যবস্থা, আর ৩৮ নং ছবিতে আবর্জনা পরিশুদ্ধন পদ্ধতি দেখান হয়েছে।

সঠিক অবস্থায় আবর্জনাকে পরিশুদ্ধ করলে, অজৈব পদার্থকে বাছাই করে শিল্পাঞ্চলের কিছু মূল উপাদান সংগ্রহ করা যায়। আর জৈব পদার্থকে সারে রূপান্তরিত করে বিক্রী করা যেতে পারে।

শুনলে অবাক হবে, আজকে শুধু কলকাতাতেই দিনে ২৬০০ টন আবর্জনা জমা হয়। রাস্তার তুপাশের ঝাঁঝরির নীচের গালিপিট থেকে ৬০০ ঘনফুট পলি ওঠে দিনে। এই মোট আবর্জনাকে কমপোষ্টিং করলে ২০০০ টন সার পাওয়া যায়। সেই সার বেচলে প্রায় ৩০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে দিনে, অর্থাৎ বছরে ১কোটি টাকা মত। ভাব তো, পড়ে থাকা জঞ্জাল থেকেই এই বিরাট টাকাও যেমন পাওয়া যাবে পরিবেশও সংগে সংগে দূষণমুক্ত হবে, ব্যাপারটা অবাক হবার মত নয় কি। আজকের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে চলেছেন।

বুঝলে তাহলে, হিসেব-নিকেশ করে চললে, ভূমি দূষণের হাত থেকেই যে শুধু রক্ষা পাওয়া যাবে তা নয়, দূষণমুক্তির জন্য যে খরচা হবে, তৈরী সার বেচে তার খরচটাও অনেকটা উঠে আসবে। বড় হও এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানবে।

শব্দ থেকে দূষণ হয় কি করে ?

শব্দও যে পরিবেশের ভারসাম্যে আঘাত করতে পারে, এ খেয়াল কিন্তু অনেকদিনই আমরা করিনি। কিন্তু বাতাসবাহী উচ্চ শব্দতরঙ্গ প্রাণী ও পশু-জগতের মনে চকিত যে আঘাত করে, তার ফলে ঐসব প্রাণী পশুদের দেহে আকস্মিক বিপর্যয় শুরু হতে পারে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে শব্দ হচ্ছে শক্তির রূপান্তরিত চেহারা। এই রূপান্তরিত শক্তি অর্থাৎ শব্দকে মানুষ, পশু-পাখী ততটাই নিজের প্রয়োজনে নিজদেহে ধারণ করতে পারে, যতটা তার প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দশক্তিকে যদি ধারণ করতে হয়, তবেতা ঐসব জীবজন্তু ও মানুষের পক্ষে ক্ষতি-কারক হয়ে দাঁড়ায়।

জীব-বিজ্ঞানীরা, চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, শব্দ দূষণের জন্য নানান্ রোগ হোতে পারে। স্নায়ু দূর্বলতা, পেটের গণ্ডোগোল, পেশীর খিঁচুনী, আন্ত্রিক আলসার, মানসিক ভারসাম্যের অভাব, রক্তচাপের প্রবলতা, স্মৃতিবিভ্রম, অনিদ্রা এসব রোগ শব্দ দূষণ থেকেই আসে। এরই সঙ্গে পশু-পাখীও নানানভাবে আক্রান্ত হোতে পারে।

শব্দদূষণ মানসিক ও দৈহিক ক্ষতি করে মানব-জীবনে বিপর্যয় আনতে পারে। পশুপাখীদের জীবনে

বিপর্যয় এনে তাদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যেতে বাধ্য করে। এভাবে পশুপাখী স্থানান্তরিত হোলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের বিপর্যয়ে পরিবেশও বিপর্যয় হয়। শব্দদূষণ তাই ভয়ংকর দূষণ।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখ, শব্দের ধারণ ক্ষমতা হিসাবে যে ইউনিট বা মান দিয়ে শব্দের উচ্চতাকে বোঝান হয়, তাকে বলে ডেসিবেল। ডেসিবেলের উৎপত্তি কি ভাবে হয়, বড় হলে বিস্তারিত জানবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখ এখন, শব্দ-ধারণ-মান বা 'পারসিভড্—নয়েস্—লেভেল' বা 'PNL'-কে মাপা হয় ডেসিবেল মানে বা PNDB দিয়ে।

শব্দশক্তির কতটা পর্যন্ত আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, সেটুকু জেনে রাখ। ৪০ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দমান মানুষের পক্ষে বিন্দুমাত্র ক্ষতিকারক নয়।

শব্দদূষণ বা শব্দমানকে সংযত করার সঠিক ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে নেওয়া হয়নি। তারই ফলে ভারতের প্রধান তিনটি শহর কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী শব্দদূষণে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর অন্যতম শব্দদূষিত শহর বলে কলকাতাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কোন শব্দমানে মানুষের কিরকম অনুভূতি হয় দেখ। এই পরীক্ষা কাউন্সিল অফ এ্যানভায়রনমেণ্ট কোয়ালিটি (আমেরিকা ১৯৭০ সালে) থেকে পাওয়া গেছে।

সারণী ঃ শব্দমানের সংগে অনুভূতির সম্পর্ক

শব্দ কোথা থেকে আসছে	শব্দমান (ডেসিবেল)	মানুষের অনুভূতি
(ক) বিপদজনক শব্দমানে যারা আছে :		
১) জেট ফাইটার প্লেন	১৪০	মনে চকিত আঘাত লাগে।
২) এ্যামপ্লিফায়ারের উচ্চমান	১৩০	অত্যন্ত পীড়াদায়ক। মাথায় যন্ত্রণা হয়।
৩) কংক্রীট ভাঙার শব্দ, জেট প্লেন উঠার সময়	১২০	অত্যন্ত পীড়াদায়ক।
৪) গাড়ীর হর্ণ (১ মিটার তরঙ্গে)	১১০	অত্যন্ত বিরক্তিকর ও কষ্টকর। কান ঝাঁ ঝাঁ করে।
৫) হৈ-হল্লা-চীৎকার (০·১৫ তরঙ্গে)	১০০	ঐ
৬) রেলের মালগাড়ী, ড্রিল মেশিন, ভারী ট্রাক (১৬ মিটার তরঙ্গে)	৯০	সাময়িক বধিরতা (৮ ঘণ্টা পর্যন্ত)
৭) লাউডস্পীকারের উচ্চমানে ব্যবহার	৮৫	ঐ

শব্দদূষণ বিপদসীমা

১)	রেলের মালগাড়ী, নিউমেটি্ক ড্রিল	৮০	বিরক্তিকর
২)	সাধারণ মটরগাড়ী (৬ মিটার তরঙ্গে) রাস্তার লোকজন যানবাহন শব্দ	৭০	সাময়িক বধিরতা, যার ফলে টেলিফোনে শব্দ শোনার অসুবিধা
৩)	এয়ার কন্‌ডিশেনিং	৬০	ঐ
৪)	হালকা অটো গাড়ী, অফিসের অভ্যন্তর	৫০	খুব কষ্টকর নয়।
৫)	সাধারণ কথাবার্তা	৪৫	ঐ

শব্দদূষণ এই স্তরের নীচে নেই

১)	শোবার ঘর, বেতারের মৃদুসংগীত	৪০	নীরবতার মত স্তর।
২)	লাইব্রেরী	৩০	খুব শান্ত।
৩)	ব্রডকাষ্টিং ষ্টুডিও	২০	ঐ
৪)	খোলা মাঠময়দান, পত্রমর্মর	১০	ক্ষীণ শব্দ। সুখপ্রদ।
৫)	জনবসতিহীন অঞ্চল	০	শব্দ বোঝা যায় কিন্তু শোনা যায় না।

এই সংগে জেনে নাও ভারতবর্ষের কিছু কিছু কলকারখানার শব্দ দূষণমান কত। ৮৩ পৃষ্ঠায় ৩৯ নং ছবিতে সেটাই বুঝিয়েছি।

এই সংগে এটাও জেনে রাখ কলকাতার শব্দদূষণ মান ৭০ থেকে ৯৫ ডেসিবেলের মধ্যে, নানান অঞ্চল মিলিয়ে। ব্যাপারটা ভয়ংকর বিপদের নয় কি ?

শব্দদূষণ মানকে নামিয়ে আনতে হলে কি কি করা দরকার :—

(১) সহজ বহনকারী যন্ত্র লাগিয়ে মূল শব্দদূষণ কেন্দ্রগুলি খুঁজে বার করা।

(২) গাড়ীতে নীচু শক্তিমানে হর্ন ব্যবহার করতে বাধ্য করা।

(৩) দ্রুতগামী ভারী যানবাহনকে শহরের মধ্যে দিয়ে যেতে না দেওয়া।

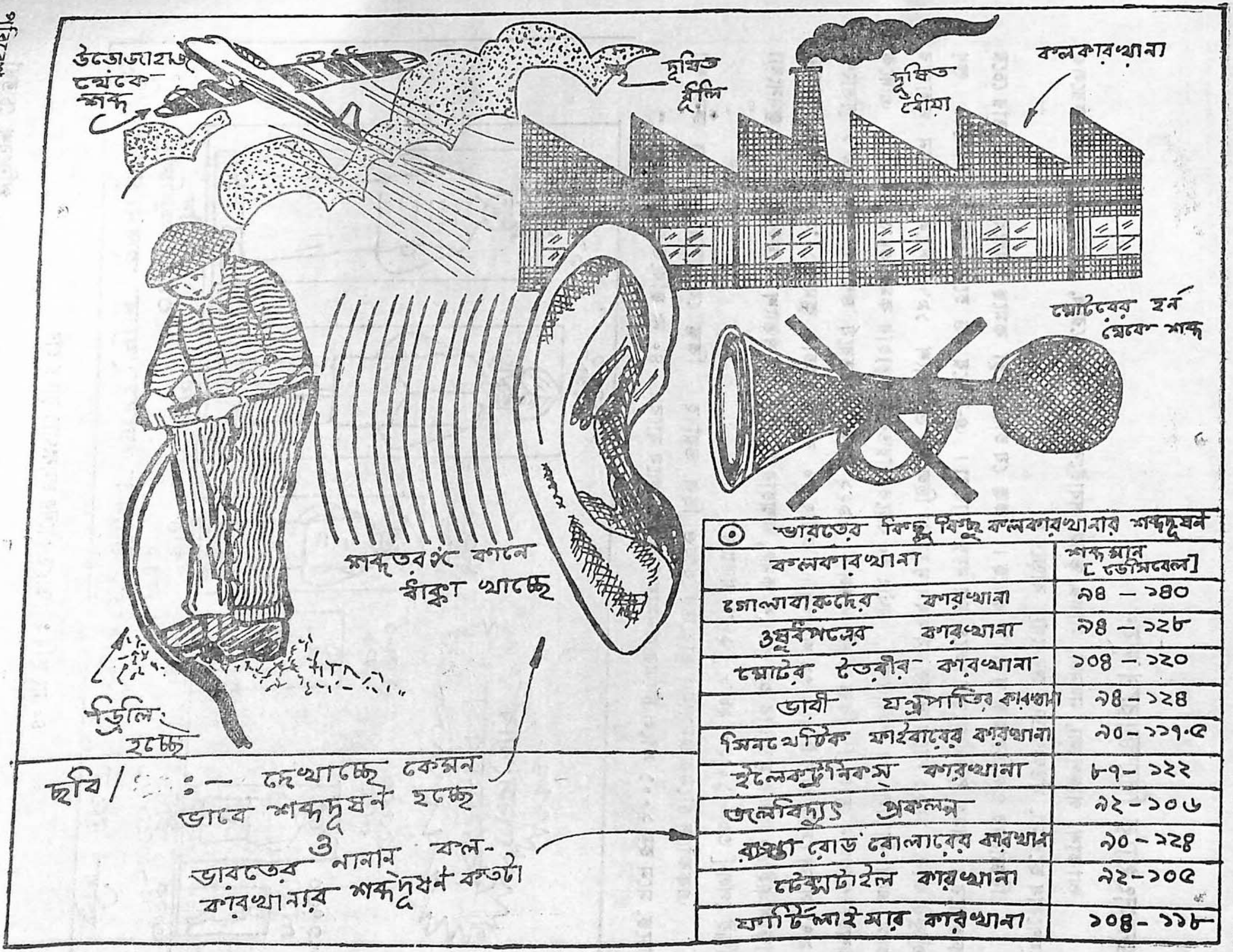
(৪) জনবসতি অঞ্চলকে ব্যবসায়িক কেন্দ্রস্থল থেকে আলাদা করা।

(৫) গাড়ীতে, কলকারখানায় শব্দ-ছাঁকুনি বা সাউণ্ড স্ক্রীন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।

এসব শুনে অনেকে বলবেন, এত সব খরচা আসবে কোত্থেকে ? একথা কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, শব্দদূষণের জন্য অজান্তেই আমরা অসুস্থ হচ্ছে, আর সে অসুখ সারাতে ডাক্তার ও ওষুধের পিছনে কম খরচা করছি না।

তাই যে স্তর থেকে শব্দদূষণ হচ্ছে তাকে সংযত করতে যা খরচা হবে, তা আমাদেরই বহন করতে হবে, আমাদের সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবেই। আর সেই খরচা শব্দদূষণ অসুস্থতার চেয়ে অনেক কম।

এখানেই কি দূষণের সব কথা শেষ হোল ? না। শব্দদূষণের চেয়েও বড় অপরাধী বর্ধিত হারে জনসংখ্যা। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। এবার সেটাই বলছি।



ভারতের কিছু কিছু কলকারখানার শব্দদূষণ	
কলকারখানা	শব্দমান [ডেসিবেল]
গোলাবারুদের কারখানা	৯৪ – ১৪০
ওষুধপত্রের কারখানা	৯৪ – ১২৮
মোটর তৈরীর কারখানা	১০৪ – ১২০
ভারী যন্ত্রপাতির কারখানা	৭৪ – ১২৪
সিনথেটিক ফাইবারের কারখানা	৯০ – ১১৭.৫
ইলেকট্রনিকস কারখানা	৮৭ – ১২২
জলবিদ্যুৎ প্রকল্প	৯২ – ১০৬
রাস্তা রোড রোলারের কারখানা	৯০ – ১২৪
টেক্সটাইল কারখানা	৯২ – ১০৫
ফার্টিলাইসার কারখানা	১০৪ – ১১৮

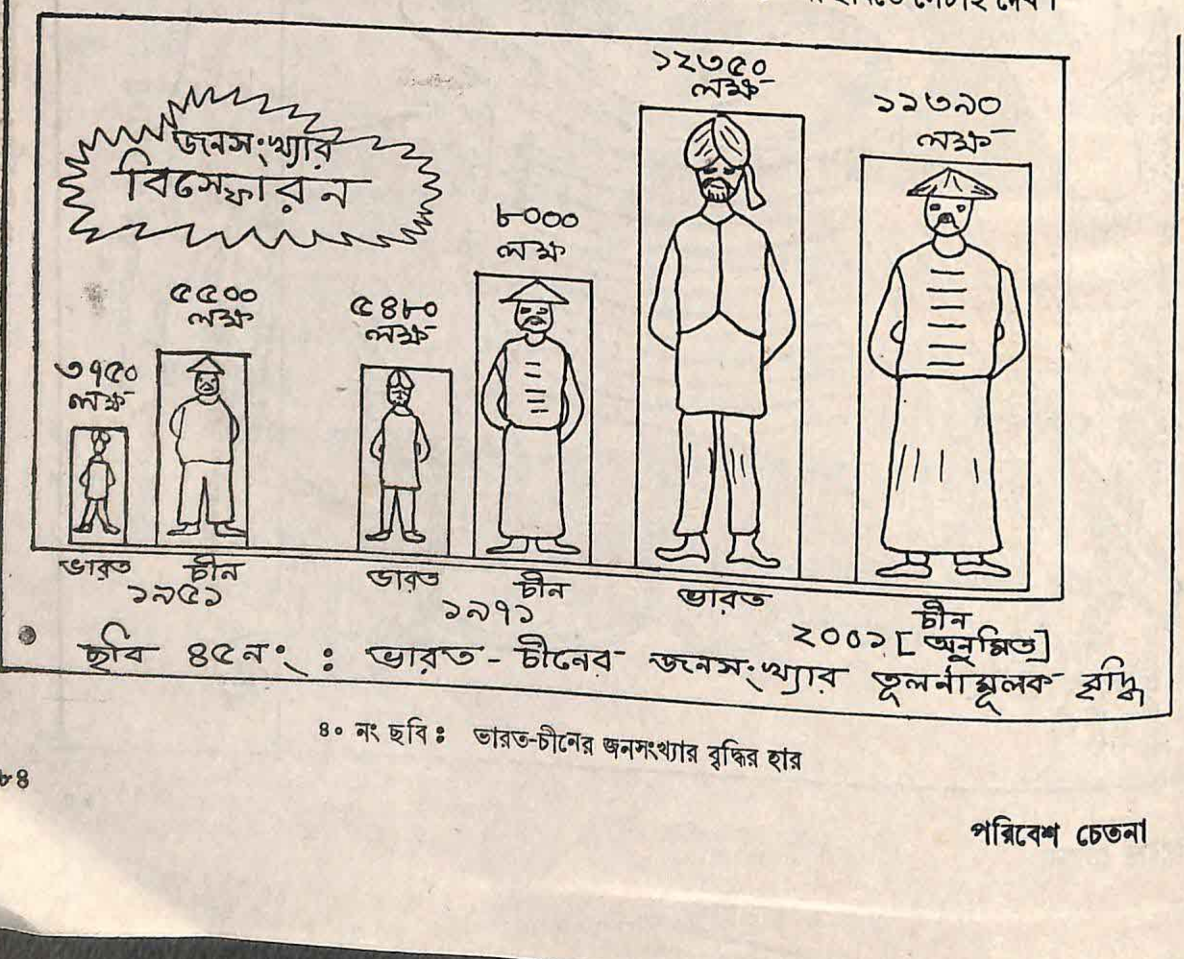
৩৯ নং ছবি ঃ ভারতবর্ষের কলকারখানার শব্দ দূষণ

জনসংখ্যার বিস্ফোরণে দূষণ

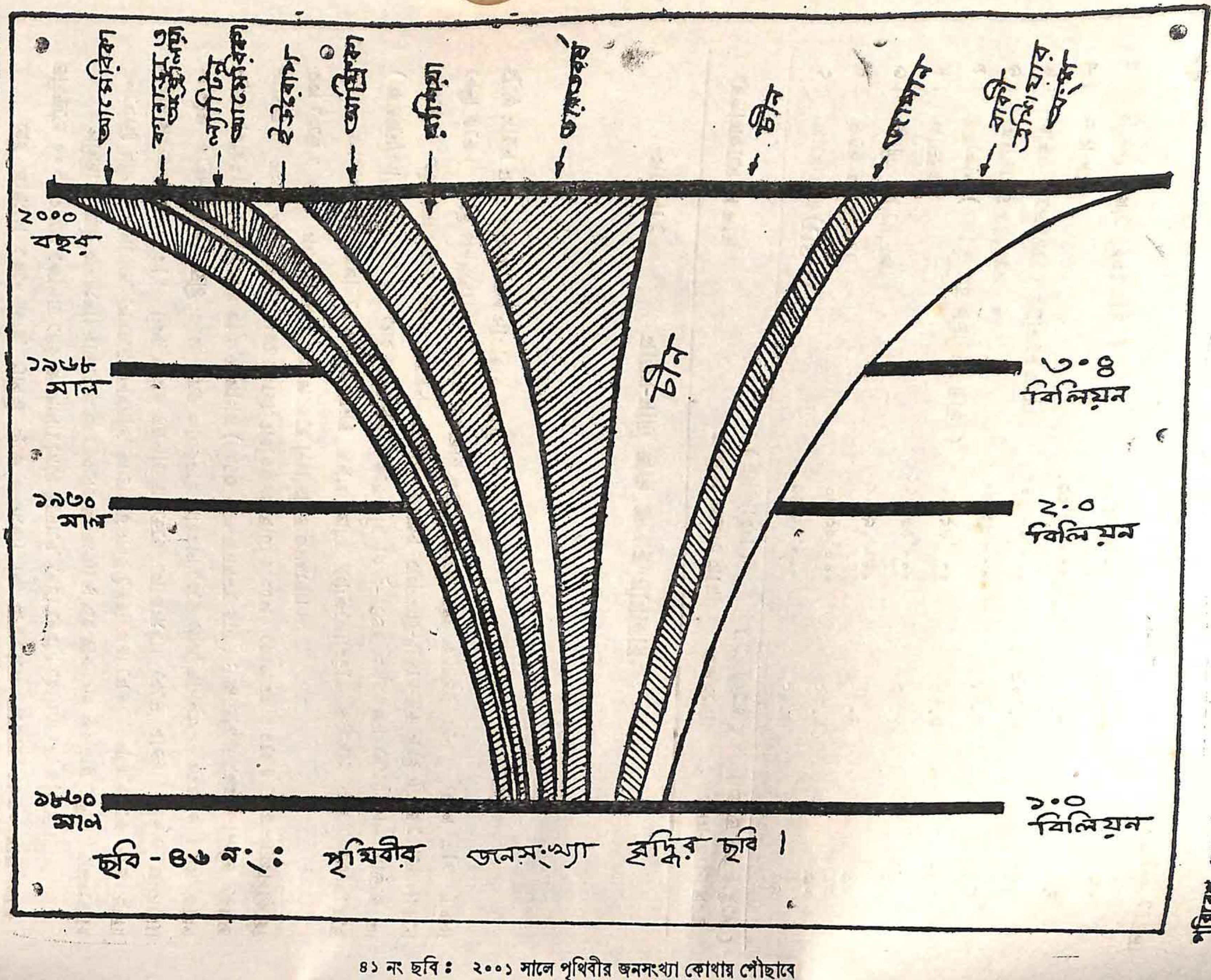
আকাশ, গাছপালা, নদনদী, সাগর, ভূপৃষ্ঠ সবাইকে সমতালে রেখে, দূষণরোধের চেষ্টা করলেও দূষণরোধ হবে না, যতক্ষণ দ্রুত জনসংখ্যা বাড়বে।

বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য মৃত্যুহার কমছে। কিন্তু যে হারে মৃত্যু কমছে জনসংখ্যা বাড়ছে তার চেয়ে দ্রুতহারে। সমগ্র পৃথিবীজুড়েই চলছে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এ-বিষয়ে বড় হলে বিস্তারিত জানবে। শুধু এটুকুই জান, ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে যখন মৃত্যুহার ছিল ৪৮·৬ শতাংশ ১৯৭১ সালে সেখানে মৃত্যুহার কমে এসে দাঁড়াল ১৪ শতাংশে। অর্থাৎ ৫০ বছরে ভারতবর্ষে মৃত্যুহার কমল ৩৪·৬ শতাংশ। এদিকে জন্মহারও কমান হোল। কিন্তু কতটা কমল? ১৯২২ সালে ভারতবর্ষে জন্মহার ছিল ৪৯·২ শতাংশ, ১৯৭১ সালে সেটা এসে দাঁড়াল ৩৯ শতাংশ। অর্থাৎ ৫০ বছরে জন্মহার কমল ১০·২ শতাংশ। তাহলে দাঁড়াল এই ৫০ বছরে মৃত্যুহার ৩৯ শতাংশ কমল, জন্মহার কমল ১০·২ শতাংশ। ফলাফল হোল জনসংখ্যা বৃদ্ধিই পেল [৩৯ − ১০·২ = ২৮·৮] ২৮·৮ শতাংশ।

এককালে চীনের জনসংখ্যা ভারতের চেয়েও ছিল ভয়াবহ। কিন্তু যে হারে ভারতের জনসংখ্যা বাড়ছে, মনে হয় ২০০১ সালে চীনের জনসংখ্যাকেও ছাপিয়ে যাবে। ৪০ নং ছবিতে সেটাই দেখ।



৪০ নং ছবি ঃ ভারত-চীনের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার



৪১ নং ছবি ঃ ২০০১ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা কোথায় পৌছাবে

এই প্রসংগে জেনে রাখ, পৃথিবী জুড়ে জনসংখ্যা কি দ্রুততালে বেড়েছে ১৮৩০ সাল থেকে। ভবিষ্যতে ২০০১ সালে কোথায় সেই জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা দেখান হোল ৪১নং ছবিতে।

পৃথিবী জুড়েই জনসংখ্যা বাড়লেও ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেই তুলনায় বেশী। জনসংখ্যার উপযোগী যদি জমি থাকত, সেখানে জনবসতি, রাস্তাঘাট সবই তৈরী করা যেত। পরিবেশকে সুস্থ সুন্দর করার সমস্যাই থাকত না। কিন্তু জমির অনুপাতের চেয়ে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা পানীয় জলের সমস্যা সৃষ্টি করল, ত্যক্ত আবর্জনার পরিমাণ বেড়ে গেল, বাসস্থানের সমস্যাও বাড়ল, কারণ প্রতি ঘনমিটারে বেশী লোক থাকতে লাগল (একে বলে জনঘনত্ব হার) ; অতিরিক্ত মলমূত্র নির্গত হোতে লাগল। সংগে সংগে খাদ্য, তরিতরকারী, সবকিছুরই ঘাটতি ঘটল। জোগানদার দলের চেয়ে ব্যবহারীকারী দল বেড়ে গেল। সব কেমন বেসামাল করে দিল বর্ধিত জনসংখ্যা।

তাহলে মূল কথা হোল, জনঘনত্ব অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটার জায়গায় কত লোক থাকছে (কতজন/বর্গকিলোমিটারে) সেই দিয়ে বুঝতে হবে পৃথিবীর ভূ-খণ্ডের ওপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে না কমছে। এই জনসংখ্যার চাপ যতক্ষণ বাড়বে ততক্ষণ জল-মাটি-বাতাস-শব্দ সবই দূষিত হোতে থাকবে বেশী করে। তাই জনসংখ্যার চাপকে কমাবার জন্য সর্বভাবে চেষ্টা করতেই হবে। দেখে নাও পৃথিবী জুড়ে মানুষ মাটি আর জলের সীমাহার কতটা।

সারণী : মানুষ-মাটি আর জলের সীমাহার

দেশ/মহাদেশে নাম	মাটি ও জলের সীমা (বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা (কোটিতে)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইলে)
১। আমেরিকা (USA)	৩৬,৭৬,০০০	২০·৫	৫৬
২। উত্তর আমেরিকা	৭৫,২৮,০০০	২২·৭	৩০
৩। ল্যাটিন আমেরিকা	৮৭,৬৭,০০০	২৮·৩	৩২
৪। আফ্রিকা	১১৬,৩৫,০০০	৩৪·৪	৩০
৫। ইউরোপ (সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া)	১৯,২৫,০০০	৪৬·৩	২৪১
৬। সোভিয়েট ইউনিয়ন	৮৫,৯৯,০০০	২৪·৬	২৯
৭। এশিয়া (সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া)	১০৩,০০,০০০	২০৫·৬	১৯৯
৮। ওসেনিয়া	৩২,৯৫,০০০	১·৯	৬
৯। পৃথিবী (আমেরিকা ছাড়া)	৫২১,২৫,০০	৩৬৩·২	৭০

এই সংগে এটাও জেনে রাখ, বিশ্বের ভূ-সম্পদের মূল্যায়ন কতটা। এই মূল্যায়ন করা হয়েছে তুলনামূলক চাষে জমির হিসাব দিয়ে।

মানুষ-মাটি-ভূমি সবার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হলে বিশ্বের ভূ-সম্পদকে মনে রাখতেই হবে। তারই সংগে জনসংখ্যার চাপকে কমাতেই হবে।

সারণীঃ বিশ্বের ভূ-সম্পদের বিন্যাস ও মূল্যায়ন

পৃথিবীর কৃষিকার্যের জমির আয়তন (হেক্টরে) যা পরিবেশ ভারসাম্য রাখছে	তুলনামূলক কর্ষণযুক্ত জমি শতাংশে			
(১) ভূখণ্ডের আয়তন— ১,৪৮০ লক্ষ হেক্টর	(১) মোট	১০—১১	(৭) ভারত	৩০.১
(২) কর্ষণযোগ্য জমি— ১৫০ লক্ষ হেক্টর	(২) ইউরোপ	৩১	(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র [আলাস্কাসহ]	১৪
(৩) তৃণাঞ্চলের জমি— (পশুচারণের জন্য) ২৬০ লক্ষ হেক্টর	(৪) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	১৬	(৯) চীন	৮.২
(৪) বনাঞ্চল— ৪০.৬ লক্ষ হেক্টর	(৪) আফ্রিকা	৯	(১০) কানাডা	২.৪
	(৫) দক্ষিণ আমেরিকা	৪	(১১) অস্ট্রেলিয়া	১.২
	(৬) জাভা [ইন্দোনেশিয়া]	৭০	(১২) ব্রাজিল	১.১

দূষণ রোধে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা কি করছেন ?

হ্যাঁ, প্রশ্নটা সংগতভাবেই আসবে। এর জন্যই তো সেই শুরুতে বলেছিলাম, স্টকহলমে ১৯৭২ সালের আলোচনার পর পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশ রক্ষার চিন্তায় বিশেষ এগিয়ে এসেছেন।

এজন্যই ভারতের ইণ্ডিয়ান ষ্টাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউট, যাকে বলে সংক্ষেপে I.S.I., তারা বিভিন্ন ধরনের কলকারখানার পরিত্যক্ত জলের মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তবুও সেসব সঠিক পালন হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য ১৯৭৪ সালে লোকসভায় বিল পাশ করে, পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চালু করেছেন "জলদূষণ প্রতিরোধ ও নিরোধ আইন"।

এরই সংগে বাতাস দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য ১৯৮১ সালে লোকসভায় বিল পাশ হয়েছে, "বাতাস দূষণ প্রতিরোধক আইন"। এই আইন রাজ্যগুলিতেও চালু হয়েছে।

ফলে জল-বাতাস দূষণকারীরা আজ আইনের চোখে অপরাধী। তাই আইন আছে, শুধু তোমরা সজাগ হলে আইন ভংগকারীরাও সচেতন হবেন। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

সচেতন হও পরিবেশকে বাঁচাতে। এর জন্য জনচেতনা দরকার। সেই পরিবেশ চেতনা তোমাদের মধ্যে দিয়েই শুরু হোক। পরিবেশ-চেতনার অস্ত্র তোমাদেরই হাতে।

———